www.banglainternet.com

George Gamow`s

Gravity

“Abhikarsa” translated by Md. Tafazzal Hossain Sarkar

জর্জ গ্যামাও

অভিকর্ষ

www.banglainternet.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় :	কিভাবে বস্তু পতিত হয়	১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	আপেল ও চাঁদ	১২
তৃতীয় অধ্যায় :	ক্যালকুলাস	২০
চতুর্থ অধ্যায় :	গ্রহসমূহের কক্ষপথ	৩০
পঞ্চম অধ্যায় :	পৃথিবী : একটি ঘূর্ণমান লাটিম	৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায় :	জোয়ার-ভাটা	৪২
সপ্তম অধ্যায় :	নভো-বলবিদ্যার জয়যাত্রা	৫২
অষ্টম অধ্যায় :	অভিকর্ষ অতিক্রমণ	৫৯
নবম অধ্যায় :	আইনস্টাইনের অভিকর্ষতত্ত্ব	৬৭
দশম অধ্যায় :	মহাকর্ষের অসমাহিত সমস্যাবলী	৮২
	ব্যবহৃত পরিভাষা	৯৩

banglainternet.com

readNshare

www.banglainternet.com

প্রথম অধ্যায়

কিভাবে বস্তু পতিত হয়

'ঊর্ধ্ব' ও 'অধঃ' দিকের ধারণা আবহমান কালের এবং ঊর্ধ্বে উত্থিত বস্তু অবশ্যই নিম্নে পতিত হবে- উক্তিটি একজন নিয়ানডারথাল* মানুষের উক্তি হতে পারে। অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীটা যখন সমতল বলে বিবেচিত হ'ত তখন ঊর্ধ্ব ছিল স্বর্গের দিক—যেখানে দেবতারা বাস করেন, আর নিম্ন ছিল পাতালপুরীর দিক। যা কিছু স্বর্গীয় নয়, স্বাভাবিকভাবে তারা ভূতলে পতিত হয় এবং স্বর্গভ্রষ্ট একজন দেবতা সঙ্গতভাবে স্বর্গচ্যুত হয়ে নিম্নের নরকে শেষ হয়ে যায়। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ইরাটোস্থেনিস ও এরিস্টার্কাস যদিও পৃথিবীর গোলত্বের অত্যন্ত প্রত্যয় উৎপাদনকারী যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তথাপি ঊর্ধ্ব ও অধঃ দিককে পরম-ভাবে চিহ্নিতকরণ গোটা মধ্যযুগ ধরে চলতে থাকে এবং এর সাহায্যে পৃথিবীর গোলত্বের ধারণাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। যুক্তি দেখানো হ'ত,—অত্যন্ত সংগত যে, সেক্ষেত্রে প্রতিপাদ স্থানে বসবাসকারী লোকেরা চিৎপাট হয়ে নিম্নে পতিত হবে এবং আরো আশঙ্কার কথা যে সমস্ত সাগরের পানি ধরাপৃষ্ঠ ত্যাগ করে ঐ একই দিকে ধাবিত হবে।

ম্যাগিলনের পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফলে যখন সকলের নিকট পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন পরম দিকরূপে চিহ্নিত ঊর্ধ্ব ও অধঃ'র ধারণাকে সংশোধন করা ছাড়া উপায় রইল না। ভূ-গোলককে মনে করা হ'ল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এর চারপাশে ঘুরে চলেছে অন্য সব মহাকাশ বাসিন্দা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই ধারণা গড়ে ওঠে গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমি এবং দার্শনিক অ্যারিস্টটল হতে। তখন মনে করা হ'ত সকল বস্তুর স্বাভাবিক গতি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে, শুধু আগুন যার মাঝে

---

* নিয়ানডারথাল মানুষের অস্থি ১৮৫৭ খ্রী. জার্মানীর এক গুহায় আবিষ্কৃত হয়। তাদের অস্থি দেখে মনে হয় তারা এক স্বতন্ত্র প্রজাতি এবং আধুনিক মানুষের সাথে তাদের গঠন-পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। অনুবাদক।

banglainternet.com

অপার্থিবের কিছু ছোঁয়া আছে যে এই নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জ্বলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড হতে ঊর্ধ্বগামী হয়। অ্যারিস্টটলের পাণ্ডিত্য ও দর্শন কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে রাখে। সেকালে বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করা হ'ত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এবং মীমাংসার সত্যতা পরীক্ষার সাহায্যে যাচাইয়ের কোন চেষ্টা করা হ'ত না। উদাহরণ স্বরূপ, সে সময়ে বিশ্বাস করা হ'ত ভারী বস্তু হালকা বস্তু অপেক্ষা অধিক দ্রুত নীচে পড়ে। কিন্তু পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে কোন পরীক্ষা সেকালে চালানো হয়েছে বলে কোন দলিল আমাদের জানা নেই। দার্শনিকদের অনুধাবন ছিল, পড়ন্ত বস্তু এত দ্রুত পড়ে যে তার গতি অনুসরণ মনুষ্য-চক্ষুর অসাধ্য।

কিভাবে বস্তু পতিত হয় এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার সূচনা করেন বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪-১৬৪২); এ সময়ে বিজ্ঞান ও কলা মধ্যযুগীয় কালনিদ্রা ভেঙে সবেমাত্র আড়মোড়া দিতে শুরু করেছে। সে সময়ের একটা গল্প, বেশ মুখরোচক কিন্তু সম্ভবতঃ সত্য নয়, এই যে সবকিছু শুরু হয় পিসা নগরীর গীর্জার একটা ঝুলন্ত বাতিদানের দোলন থেকে; গ্যালিলিও গীর্জার উপাসনায় যোগদান কালে অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য করেন একটি বাতিদান, যা জ্বালানোর সময়ে একপাশে টেনে ছেড়ে দেওয়ার ফলে দুলছিল। তিনি লক্ষ্য করেন যে দোলনের বিস্তার ধীরে ধীরে কমতে থাকলেও দোলনের সময় (একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যাওয়া ও ফেরৎ আসার সময়) স্থির থাকে। বাড়ি ফিরে তিনি এই হঠাৎ করে লক্ষ্য করা বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সুতা দিয়ে প্রস্তরখণ্ড ঝুলিয়ে মাড়ীর স্পন্দন দিয়ে সময় মেপে পরীক্ষা চালান। সত্যই তো দোলনকাল সমান থাকছে, যদিও দোলনের বিস্তার ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। কৌতূহলী স্বভাবের গ্যালিলিও একের পর এক পরীক্ষা করতে থাকেন—বিভিন্ন ভরের প্রস্তরখণ্ড এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সুতা ব্যবহার করে। এ সকল পরীক্ষা থেকে তিনি এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের সম্মুখীন হন; যদিও সুতার দৈর্ঘ্যের উপরে দোলনকাল নির্ভর করে (দৈর্ঘ্য বেশী হলে সময় বেশী লাগে), কিন্তু দোলনের সময় প্রস্তরখণ্ডের ভরের উপর নির্ভরশীল নয়। এই পর্যবেক্ষণ কল ভারী বস্তুর অপেক্ষাকৃত দ্রুতপতনের তৎকালীন স্বীকৃত সত্যের বিরোধিতা করে।

প্রকৃতপক্ষে, দোলকের গতি কোন ভরের পড়ন্ত গতি ছাড়া আর কিছু নয়, কেবলমাত্র সুতা দ্বারা আবদ্ধ থাকার ফলে ভারী ঝুলনবিন্দু কেন্দ্রিক একটি

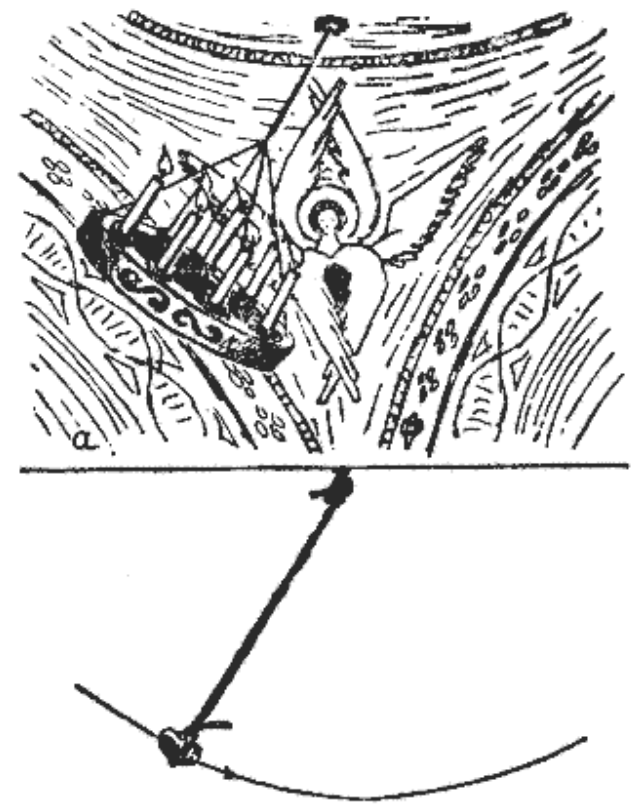

চিত্র ১. একটি লোহবাতিদানি এবং দড়িতে বাঁধা পাথর একই পর্যায়ে দোলে যদি ঝুলনের দৈর্ঘ্য একই হয়।

বৃত্তের চাপ বরাবর দুলতে থাকে। যদি ভারী ও হালকা বস্তু একই দৈর্ঘ্যের সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে, একই কৌণিক বিস্তারে দুলিয়ে দিলে একই সময়ে সর্বনিম্ন বিন্দুতে আসে তবুও তারা একই সময়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়বে যদি একই উচ্চতা হতে এক সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়। অ্যারিস্টটলীয় চিন্তার ধারক ও বাহকদের কাছে সত্যটি প্রতিষ্ঠার জন্য গ্যালিলিও পিসার

banglainternet.com

ঝুঁকে পড়া গীর্জার টাওয়ারে বা অন্য কোন টাওয়ারে আরোহণ করেন (সম্ভবতঃ তিনি তাঁর কোন ছাত্রকে আরোহণ করতে নির্দেশ দেন) এবং একটি হালকা ও একটি ভারী বস্তু একসাথে নীচে ফেলে দেন; বস্তু দু'টি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিস্ময় উদ্রেক করে একসাথে নীচে পতিত হয়।

পরীক্ষাটি সম্পন্ন করার কোন সরকারী দলিল, মনে হয়, নেই। কিন্তু মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর গতি যে তার ভরের উপর নির্ভরশীল নয় এ সত্যের প্রথম আবিষ্কর্তা হলেন গ্যালিলিও। পরবর্তীকালে আরও অনেক সূক্ষ্ম ও নির্ভুল পরীক্ষার সাহায্যে সত্যটির যাচাই হয়েছে এবং গ্যালিলিও'র মৃত্যুর ২৭২ বছর পর এই সত্যটিকে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্বভিত্তিক অভিকর্ষ সূত্রের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন; তত্ত্বটি এই পুস্তকের শেষের দিকে বর্ণনা করা হবে।

স্পষ্টতঃ অতি সহজে গ্যালিলিও'র পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা যায়, এ জন্য সত্যি সত্যিই কাউকে পিসা নগরীতে যেতে হবে না। একটা মুদ্রা ও একখণ্ড কাগজ নিয়ে নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে মেঝের দিকে ছেড়ে দিন; দেখবেন মুদ্রাটা তাড়াতাড়ি আর কাগজটা একটু সময় নিয়ে মেঝেতে পৌঁছে। কিন্তু যদি কাগজটা দলা পাকিয়ে ছেড়ে দেন তাহলে তারা প্রায় সমান দ্রুত পড়বে। একটা দীর্ঘ কাঁচের সিলিণ্ডারের মধ্যের বায়ু বের করে তার মধ্যে মুদ্রা, দলা না পাকানো কাগজ ও একটা পালক পুরে ছেড়ে দিলে দেখবেন তারা সমান দ্রুত পড়ছে।

পড়ন্ত বস্তুর গতি সম্পর্কে গ্যালিলিও'র পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল পড়বার সময় ও অতিক্রান্ত দূরত্বের গাণিতিক সম্বন্ধ নির্ণয়। যেহেতু শুধু চোখে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর গতি অনুসরণ করা সত্যি দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং মুভি ক্যামেরার মতো অত্যাধুনিক যন্ত্র সেকালে ছিলও না, এজন্য গ্যালিলিও ঠিক করেন খাড়াভাবে বস্তুকে নীচের দিকে পড়তে না দিয়ে মাধ্যাকর্ষণকে 'নিস্তেজ' করতে হবে বস্তুকে হেলান তলে (inclined plane) গড়িয়ে পড়তে দিয়ে। হেলানতল বস্তুর ওজনকে আংশিকভাবে ঠেকা দেয়। এজন্য তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে এই তলে বস্তুর গতি পড়ন্ত বস্তুর মতোই হবে এবং শুধুমাত্র তলের কৌণিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে পড়ার সময়টা কিছু দীর্ঘ হবে। সময় মাপার জন্য তিনি জল-ঘড়ির ব্যবহার করেন; এখানে একটা ছিপিকে ইচ্ছামতো খোলা ও বন্ধ করার ব্যবস্থা ছিল। ছিপি

দিয়ে নির্গত পানির ওজন থেকে তিনি সময় মাপতে পারতেন। বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত পরপর দূরত্বগুলি তিনি হেলান তলের উপর চিহ্নিত করেন।

চিত্র ২. পিসায় গ্যালিলিও'র পরীক্ষা।

আপনি অতি সহজে গ্যালিলিওর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে তাঁর প্রাপ্ত ফলের সত্যতা যাচাই করতে পারেন।* ছয় ফুট লম্বা একটা মসৃণ বোর্ড

* লেখক একজন ব্যবহারিক বিজ্ঞানী না হওয়ায় তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে সক্ষম নন যে গ্যালিলিওর পরীক্ষা সম্পন্ন করা কত সহজ; তবে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে জেনেছেন যে, পরীক্ষাটা খুব সহজ নয় এবং তিনি পাঠকদের দক্ষতা পরীক্ষা জন্য এটি সম্পন্ন করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

banglainternet

নিন; তারপর এই বোর্ডের এক প্রান্তের নিচে গোটা দুই বই রেখে একে মাটি থেকে দুই ইঞ্চির মতো উঁচু করুন (চিত্র ৩ক)। এখন এই বোর্ডের ঢালের (slope) পরিমাণ হবে $\frac{২}{৬\times১২}=\frac{১}{৩৬}$ এবং মাধ্যাকর্ষণ এই অনুপাতে কমে যাবে। একটি ধাতব সিলিণ্ডারকে (এটি বলের চেয়ে আস্তে গড়াবে) বোর্ডের উপর প্রান্ত থেকে ঠেলা না দিয়ে গড়িয়ে পড়তে দিন। একটি ঘড়ির টিক শব্দ অথবা মেট্রোনোম (তবলার মতো সঙ্গীতের তাল রাখার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র) শুনে পড়ন্ত সিলিণ্ডারের অবস্থান ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সেকেণ্ড অন্তে বোর্ডের উপর চিহ্নিত করুন। (পরীক্ষাটি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে হবে)। এ অবস্থায় উঁচু

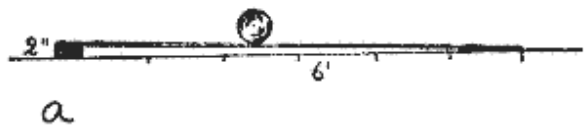

a

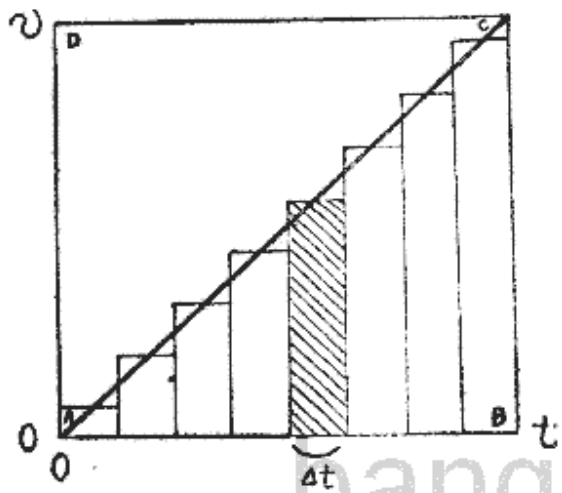

চিত্র ৩. হেলান তলে একটি গড়ায়মান বেলন। গ্যালিলিওর সমাকলন পদ্ধতি।

প্রান্ত হতে অবস্থানগুলির মাপ হবে যথাক্রমে ১.৫৬, ১৪.৩, ৩২.২, ৫৭, (৮৯.৩) ইঞ্চি। দেখতে পাবেন, যেমন গ্যালিলিও দেখেছিলেন যে ২য়, ৩য়, ৪র্থ সেকেণ্ড অন্তে। সিলিণ্ডারের অবস্থান ১ম সেকেণ্ড অন্তে অবস্থানের ৪, ৯, ১৬ ও ২৫ গুণ বেশী দূরে। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়, পড়ন্ত বস্তুর বেগ বৃদ্ধি এমনভাবে ঘটে যে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব তার সময়ের বর্গের অনুপাতে বৃদ্ধি পায় ($৪=২^২$, $৯=৩^২$, $১৬=৪^২$, $২৫=৫^২$)। প্রথমে একটি কাঠের সিলিণ্ডার নিয়ে তারপর আরও পাতলা বালসা কাঠের সিলিণ্ডার নিয়ে পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করুন; দেখতে পাবেন অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং বেগ নির্দিষ্ট সময়ান্তে অপরিবর্তিত থাকছে।

এরপর গ্যালিলিও যে সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তা হচ্ছে সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যা থেকে পরিশেষে উপরে উল্লেখিত সময় দূরত্বের সম্বন্ধ পাওয়া যাবে। তিনি Dialogue Concerning two New Sciences নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের বর্গের অনুপাতে বাড়বে যদি বেগ সময়ের ১ম শক্তির অনুপাতে বাড়বে। ৩-খ চিত্রে আমরা গ্যালিলিওর যুক্তির কিছুটা আধুনিক সংস্করণ চিত্রিত করেছি। এখানে বস্তুর বেগ (v) ও সময় t এর একটি লেখ-চিত্র আঁকা হয়েছে। v যদি t এর সমানুপাতিক হয় তাহলে লেখ-চিত্রটি (O, C) ও (v, t) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা হবে। এখন O হতে t পর্যন্ত সময়কে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমানভাগে ভাগ করে ভাগ বরাবর উল্লম্ব (vertical) রেখা টানি। ফলে চিত্রের মতো অনেকগুলি পাশে ছোট লম্বা আয়তক্ষেত্র পাওয়া গেল। এখন হেলান তলের মসৃণ গতির বদলে, সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়লে যেমন একটা অনিয়মিত গতির সৃষ্টি হয়- হঠাৎ করে গতির পরিবর্তন, কিছু সময় স্থির গতি হয়—তেমন গতি বিবেচনা করি। t অক্ষের ভাগকে যদি ক্রমাগত বর্ধিত করা যায় তাহলে গতির হঠাৎ পরিবর্তন ও স্থির গতির মাঝে পার্থক্য কমতে কমতে বিভাগ-সংখ্যা অসীম হলে তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে।

ক্ষুদ্র যে সময়ে বস্তুর গতি স্থির থাকে সে সময়ের বেগকে সময় দিয়ে গুণ করে অতিক্রান্ত দূরত্ব পাওয়া যাবে। কিন্তু বেগের মান আয়তক্ষেত্রের উচ্চতার মানের সমান এবং সময় আয়তক্ষেত্রের ভূমির সমান বলে এই গুণফল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। প্রতিটি ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রের জন্য

banglainternet.com

এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, O হতে t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব সিঁড়ির ধাপগুলির ক্ষেত্রফলের সমান এবং t-এর বিভাগ-সংখ্যা অসীম হলে তা ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রফলের সমান। কিন্তু এই ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্র ABCD এর অর্ধেক এবং ABCD এর ক্ষেত্রফল ভূমি t ও উচ্চতা v-এর গুণফলের সমান। এজন্য t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্বের জন্য আমরা লিখতে পারি :

$S = \frac{1}{2}vt$, যেখানে t সময়ে বেগের পরিমাণ v

কিন্তু আমাদের স্বীকার্য অনুসারে v, t এর সমানুপাতিক ; কাজেই $v = at$ যেখানে a একটি ধ্রুবক এবং বেগ পরিবর্তনের হার ত্বরণের সমান। উপরের দুটি সূত্রের সাহায্যে আমরা পাই,

$S = \frac{1}{2}at^2$ এবং এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে অতিক্রান্ত দূরত্ব বেগের বর্গের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

কোন জ্যামিতিক ক্ষেত্রকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র অংশে বিভক্তিকরণ ও বিভাগ সংখ্যা অসীম হওয়ার কারণে অংশগুলির আকার বেশীরকম ক্ষুদ্র হওয়ায় প্রাপ্ত ফলের বিবেচনা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক গণিতবিদ আর্কিমিডিস কর্তৃক শঙ্কু (cone) ও অন্যান্য জ্যামিতিক আকারের বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু গ্যালিলিওই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রক্রিয়াটিকে বলবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন এবং এভাবেই এক নতুন পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে নিউটনের হাতে গণিতশাস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখারূপে বিস্তৃতি লাভ করে।

এই নব-বলবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হচ্ছে গতির উপরিপাতন (superposition) প্রক্রিয়ার আবিষ্কার। আমরা যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ভূমিতলের আনুভূমিকভাবে নিক্ষেপ করি আর যদি মাধ্যাকর্ষণ না থাকে তাহলে প্রস্তর খণ্ডটি বিলিয়ার্ড টেবিলে বিলিয়ার্ড বলের মতো সরলরৈখিক পথে চলতে থাকবে। অন্যদিকে, প্রস্তরখণ্ডকে খাড়া নীচের দিকে পড়তে দেওয়া হলে খণ্ডটি ক্রমবর্ধিত বেগের সাথে নীচে পড়তে থাকবে যার আলোচনা আমরা একটু পূর্বেই করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা দু'টি বেগের উপরিপাতন পাই : প্রস্তরখণ্ড সমবেগে আনুভূমিক দিকে চলে এবং একই সঙ্গে খাড়াভাবে ত্বরান্বিত গতি সহকারে

পড়ে। অবস্থাটি নিচের চিত্রে লেখ-চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। প্রস্তর খণ্ডের লব্ধি অবস্থানসমূহ তীরের (সাদা মাথা) মাথা থেকে পাওয়া যাবে : এই তীর ক্রমাগত লম্বা হয়েছে ও মূলবিন্দু কেন্দ্রিক ঘুরে গেছে।

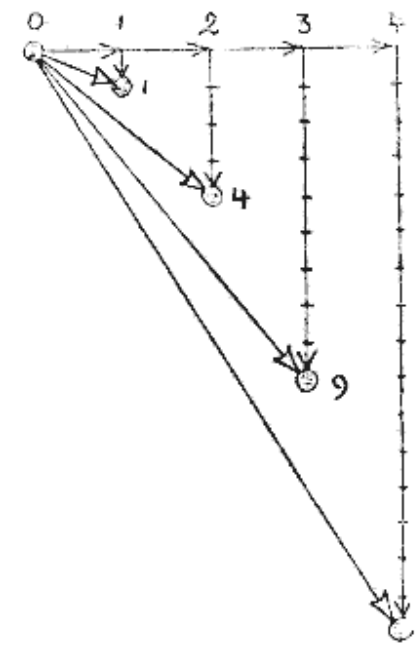

চিত্র ৪. ধ্রুব বেগসহ আনুভূমিক গতি এবং উল্লম্ব সমত্বরণ বিশিষ্ট গতির সমন্বয়।

মূলবিন্দুর সাপেক্ষে গতিশীল বস্তুর পরপর অবস্থান নির্দেশকারী এ ধরনের তীরকে সরণ ভেক্টর বলা হয়। এই ভেক্টর তার দৈর্ঘ্য ও দিক দ্বারা নির্দিষ্ট। কোন বস্তু যদি পরপর কয়েকটি সরণ দ্বারা অবস্থান-ভ্রষ্ট হয় এবং প্রত্যেক সরণ যথাযথ সরণ ভেক্টর দ্বারা নির্দেশিত হয় তাহলে বস্তুর চূড়ান্ত অবস্থান একটি মাত্র সরণ ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা যাবে এবং বলা হবে যে এই ভেক্টরটি পূর্বের ভেক্টরগুলির যোগফলের সমান। আপনি পূর্ববর্তী তীরের মাথা থেকে পরের তীরের গোড়া শুরু করে একটার পর একটা তীর আঁকতে থাকুন এবং সবশেষে প্রথম

banglainternet.com

তীরের গোড়ার সাথে শেষ তীরের মাথা সরলরেখা দ্বারা যোগ করে দিন। উদাহরণস্বরূপ, সোজা কথায়, একটি উড়োজাহাজ যদি নিউইয়র্ক থেকে শিকাগো, শিকাগো থেকে ডেনভার এবং শেষে ডেনভার থেকে ডালাস যায় তাহলে উড়োজাহাজটি নিউইয়র্ক থেকে সোজা পথে ডালাস গিয়ে পৌঁছাতে পারে। দু'টি ভেক্টরের যোগের অন্য একটি উপায় হচ্ছে তাঁর দু'টিকে একই বিন্দু থেকে আঁকার পর সামান্তরিক সম্পূর্ণ করে কর্ণ অঙ্কন করা, যেমন ৫নং চিত্রের ক ও খ-তে দেখানো হয়েছে। দু'টি চিত্রের তুলনা করলে সহজেই মেনে নিতে হয় যে উভয় ক্ষেত্রে একই ফল পাওয়া যায়।

সরণ ভেক্টর ও তাদের যোগের ধারণা বলবিদ্যার অন্যান্য দিক রাশির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কল্পনা করুন, একটি উড়োজাহাজবাহী সমুদ্রপোত নির্দিষ্ট বেগে উত্তর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একজন নাবিক তার ডেক বরাবর মিনিটে নির্দিষ্ট বেগে জাহাজের ডানপাশ হতে বামপাশের দিকে দৌড়াচ্ছে। উভয় বেগ বরাবর তীর এঁকে এবং বেগের অনুপাতে তীরের দৈর্ঘ্য নিয়ে (অবশ্যই একই এককে দৈর্ঘ্য নিতে হবে) বেগ নির্দেশ করা যাবে। পানির তুলনায় নাবিকের বেগ কত? এর জন্য পূর্বের নিয়মে দু'টি বেগ ভেক্টরের যোগফল নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ দু'টি ভেক্টরকে সন্নিহিত বাহু নিয়ে সামান্তরিক সম্পূর্ণ করে কর্ণ আঁকতে হবে।

বলকেও ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা যায়; ভেক্টরের দিক হবে প্রযুক্ত বলের দিক এবং দৈর্ঘ্য হবে বলের মানের সমান আর একই নিয়ম অনুসারে তাদের যোগ করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, হেলানো তলে অবস্থিত একটি বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের ভেক্টর নেওয়া যাক (চিত্র ৫ গ)। এই ভেক্টরটি অবশ্যই খাড়া নিম্নমুখী হবে; কিন্তু ভেক্টর যোগ নিয়মের উল্টো প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা একে দুই (বা ততোধিক) ভেক্টরের যোগফলরূপে নির্দেশ করতে পারি। আমাদের উদাহরণে একটি ভেক্টরকে আমরা হেলানো তলের সমান্তরাল এবং অন্যটি এইটির লম্ব বরাবর নিতে চাই। দেখা যায়, সমকোণী ত্রিভুজ ABC (হেলানো তল) এবং abc (F, F_p এবং F_t দ্বারা গঠিত) পরস্পর সদৃশ কারণ A এবং a বিন্দুতে কোণগুলি সমান। ইউক্লিডীয় জ্যামিতি হতে পাওয়া যায়,

$$\frac{F_2}{F} = \frac{BC}{AC}$$

এবং এই সমীকরণটি উল্লেখিত গ্যালিলিও'র হেলানো তলের পরীক্ষাফল সম্বন্ধে আমাদের সমস্যার ব্যাখ্যা প্রমাণ করে।

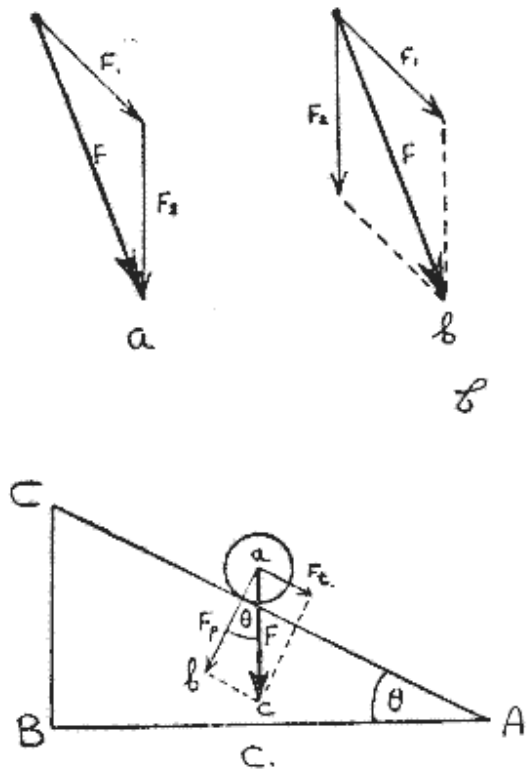

চিত্র ৫. (a) ও (b) ভেক্টর যোগ করার দুটি পদ্ধতি, হেলানো তলে স্থাপিত একটি বেলনের উপর ক্রিয়ারত বলসমূহ।

হেলানো তলের পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত (data) দ্বারা একজন মুক্তভাবে পতনের জন্য বস্তুর ত্বরণ ৩৮৬.২ ইঞ্চি/বর্গ সেকেণ্ড পেতে পারে। (সম্ভবত: আপনি এর সমতুল্য মান ৩২.২ ফুট/বর্গ সেকেণ্ড এর সাথে পরিচিত) বা মেট্রিক এককে ৯৮১ সে.মি/বর্গসেকেণ্ড। ত্বরণের এই মান ভূ-পৃষ্ঠের অক্ষাংশ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার সাথে সামান্য পরিবর্তিত হয়।

banglainternet.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আপেল ও চাঁদ

গাছ থেকে আপেলের পতন দেখে নিউটন কর্তৃক মহাজাগতিক অভিকর্ষ-সূত্র আবিষ্কারের গল্পটি গ্যালিলিও'র পিসার গীর্জায় বাতিদানের দোলন লক্ষ্য করার মতো পৌরাণিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি যে পৌরাণিক গল্পে আপেলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ইডের আপেল—যার জন্য নাকি স্বর্গ হতে তারা বহিষ্কৃত হয়, প্যারিসের আপেল—যার জন্য ট্রয়ের যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং উইলিয়ামটেলের আপেল—যা থেকে নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে স্থিতিশীল এবং শান্তিপ্রিয় দেশের সৃষ্টি হয়, তাদের আপেলের মতো নিউটনের আপেল অত্যন্ত সঙ্গতভাবে সমান মর্যাদা পেতে পারে। তেইশ বছর বয়সী নিউটন যখন অভিকর্ষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন তখন তিনি যে গাছ থেকে আপেলের পতন লক্ষ্য করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই; কারণ ১৬৬৫ সালের লণ্ডনে প্লেগ এমন মহামারী আকারে দেখা দেয় যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্লেগ হতে আত্মরক্ষার্থে নিউটন সে বছর লিঙ্কনশায়ারের একটি খামারে অবস্থান করতে থাকেন। নিউটন তাঁর লেখায় মন্তব্য করেছিলেন "সে বছর আমি চিন্তা করতে থাকি যে অভিকর্ষ চাঁদ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং চাঁদকে তার কক্ষপথে রাখতে যে বলের দরকার, তার সাথে ভূ-পৃষ্ঠের অভিকর্ষ বলের তুলনা করি।" এ বিষয়ে তাঁর উক্তি পরবর্তীকালে "Mathematical Principle of Natural Philosophy" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছিল যা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ: পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে যদি আনুভূমিকভাবে গুলী ছোঁড়া হয় তাহলে বুলেটের বেগের দু'টি অংশ থাকে: (ক) আনুভূমিক গতি যা বন্দুকের নল থেকে বহির্গত হওয়ার সময়ের বেগের সমান এবং (খ) মাধ্যাকর্ষণ বলের অধীনে ত্বরণযুক্ত মুক্ত পতন বেগ। এই দুই গতির উপরিপাতনের ফলে বুলেটটি অধিবৃত্ত পথে চলে কিছু দূরে নীত হয় এবং মাটিতে আঘাত করে। পৃথিবী-

চিত্র ৬. লিঙ্কনশায়ার খামারে আইজাক নিউটন।

পৃষ্ঠ সমতল হলে বুলেট সকল সময়ে মাটিকে আঘাত করবে যদিও আঘাত স্থল বন্দুক হতে বেশ দূরে থেকে পারে। কিন্তু যেহেতু পৃথিবী গোলাকার, অতএব ভূ-পৃষ্ঠের ক্রমান্বয়িক বক্রতার জন্য বুলেটের পথও বাঁকা হতে

banglainternet.com

থাকবে এবং একটি নির্দিষ্ট বেগের জন্য বুলেট ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতাকে অনুসরণ করতে পারে। এভাবে, যদি বাতাসের বাধা না থাকে তাহলে বুলেটটি কোনদিনই ভূ-পৃষ্ঠে পতিত না হয়ে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে। এটিই ছিল কৃত্রিম উপগ্রহের প্রথম চিন্তা এবং নিউটন ধারণাটিকে এমন চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছিলেন যা রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ বিষয়ক সরল রচনাসমূহে আজকাল দেখা যায়। অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পর্বত-শীর্ষ হতে ছোঁড়া হয় না; এগুলি প্রথমত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত খাড়া উপর দিকে তোলা হয়, তারপর বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণনের জন্য দরকারী আনুভূমিক বেগ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। চাঁদের গতি এ ধরনের ক্রমানুয়ে পতনশীল গতি যা সকল সময়ে ভূ-পৃষ্ঠকে স্পর্শ করতে অসমর্থ হচ্ছে। চাঁদের গতিকে এভাবে লেখে নিউটন চাঁদের উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের মান নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ বলের হিসাবের বর্তমান পদ্ধতিটা অনেকটা এরূপ :

ধরা যাক, চাঁদ বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। নির্দিষ্ট কোন সময়ে এর অবস্থান হবে M বিন্দুতে এবং কক্ষপথের ব্যাসার্ধের লম্ব বরাবর চাঁদের বেগ হবে v। চাঁদ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হলে এ সরল রেখা বরাবর চলতে থাকত এবং ক্ষুদ্র সময় Δt পরে M' অবস্থানে পৌঁছাত, যেখানে $\overline{MM'} = v\Delta t$. কিন্তু চাঁদের গতির আরেকটা অংশ আছে—তা হচ্ছে পৃথিবীর দিকে পতনশীল গতি। কাজেই এর গতিপথ বেঁকে যায় এবং M' বিন্দুতে আসার পরিবর্তে চাঁদ তার বৃত্তাকার গতিপথের M'' বিন্দুতে আসে এবং MM'' দূরত্বটি পৃথিবীর দিকে চাঁদের Δt সময়ে পতনশীল গতির কারণে অতিক্রান্ত দূরত্ব। এখন EMM' সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপপাদ্য— 'সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র উহার অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান'—প্রয়োগ করলে পাওয়া যায়,

$(\overline{EM''} + \overline{M''M'})^2 = \overline{EM'}^2 + \overline{MM'}^2$ বা, বর্গ করে পাওয়া যায়, $\overline{EM''}^2 + 2\overline{EM''}.\overline{M''M'} + \overline{M''M'}^2 = \overline{EM'}^2 + \overline{MM'}^2$

যেহেতু $\overline{EM'} = \overline{EM}$, অতএব আমরা উভয়-পার্শ্ব হতে এদের বাদ দিই

এবং $2\overline{EM}$ দ্বারা ভাগ করে লিখি,

$$\overline{M''M'} + \frac{\overline{M''M'}^2}{2\overline{EM}} = \frac{\overline{MM'}^2}{2\overline{EM}}$$

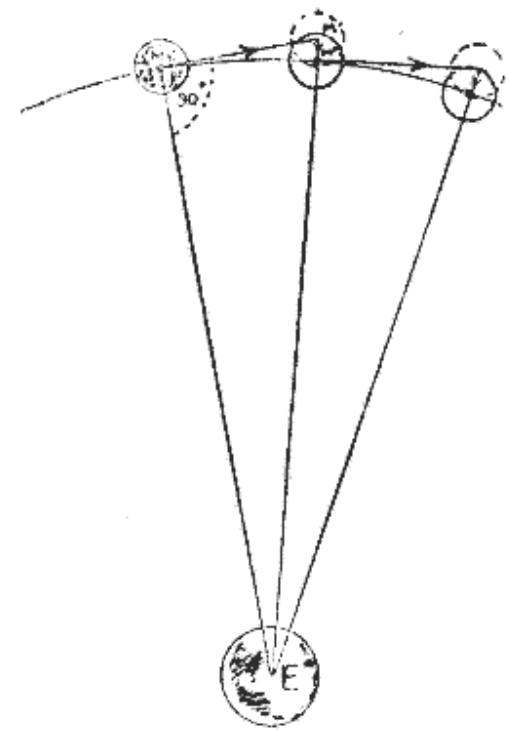

চিত্র ৭. চন্দ্রের ত্বরণের হিসাব।

এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে। যদি সময়ের অন্তরকে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর বিবেচনা করি তাহলে $M''M'$ একই-ভাবে ছোট হতে থাকে এবং বামপার্শ্বের দুটি পদই শূন্যের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু যেহেতু ২য় পদটিতে $\overline{M''M'}$ এর বর্গ আছে এজন্য এই পদটি প্রথমটি অপেক্ষা দ্রুত শূন্যের কাছাকাছি আসে; প্রকৃতপক্ষে

banglainternet.com

যদি $\overline{M''M'}$ এর মান হয় $\frac{১}{১০}$, $\frac{১}{১০০}$, $\frac{১}{১০০০}$ ইত্যাদি তাহলে এর বর্গের মান দাঁড়ায়, $\frac{১}{১০০}$, $\frac{১}{১০০০}$, $\frac{১}{১০০০০০০}$ ইত্যাদি। এজন্য অতিক্ষুদ্র সময় অন্তরের জন্য আমরা প্রথম পদের তুলনায় দ্বিতীয় পদকে অগ্রাহ্য করে লিখি : $M''M' = \frac{MM'}{2EM}$; এভাবে লেখায় কোন ভুল হবে না, অবশ্য যদি $\overline{M''M'}$ খুব ছোট হয়।

$\overline{MM'} = v\Delta t$ এবং $\overline{EM} = R$ হওয়ায় আমরা উপরের সম্বন্ধকে লিখতে পারি, $\overline{M''M'} = \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{R}\right)\Delta t^2$

গ্যালিলিও কর্তৃক পড়ন্ত বস্তুর পরীক্ষার আলোচনা কালে আমরা দেখতে পেয়েছি যে Δt সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্বের মান $\frac{1}{2}a\Delta t^2$, যেখানে a ছিল ত্বরণ; কাজেই দু'টি সম্বন্ধের তুলনা করে আমরা সিদ্ধান্ত টানি যে v^2/R হচ্ছে ঐ ত্বরণ a, যে ত্বরণে চাঁদ ক্রমাগতভাবে পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে, কিন্তু কোন সময়েই একে স্পর্শ করতে পারে না।

এজন্য আমরা ত্বরণের জন্য লিখি,

$a = v^2/R = (v/R)^2 R = w^2R$, যেখানে $w = \frac{v}{R}$, কক্ষপথে চাঁদের কৌণিক বেগের মান। কৌণিক বেগ w (গ্রীক অক্ষর ওমেগা) ঘূর্ণায়মান বস্তুর প্রদক্ষিণ কাল T-এর সাথে সহজ সম্পর্কযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে, আমরা এই সম্পর্কটাকে লিখতে পারি,

$w = \frac{2\pi v}{2\pi R} = 2\pi\frac{v}{S}$, যেখানে $S = 2\pi R$, কক্ষপথের দৈর্ঘ্য। সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে প্রদক্ষিণ-কাল T, $\frac{S}{v}$ এর সমান যার ফলে পাওয়া যাচ্ছে $w = \frac{2\pi}{T}$. পৃথিবীর চারপাশ একবার প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের ২৭·৩ দিন বা $২·৩৫ \times ১০^৬$ সেকেণ্ড সময় লাগে। উপরের সম্বন্ধে T এর এই মান বসিয়ে আমরা পাই, $w = ২·৬৭^{-৬}$ $\frac{১}{\text{সেকেণ্ড}}$ w এর এই মান ব্যবহার করে এবং $R = ৩৮৪০০০$ কিলোমিটার $= ৩·৮৪ \times ১০^{৮}$ সেন্টিমিটার

মিটার নিয়ে নিউটন চাঁদের পড়ন্ত গতির ক্ষেত্রে ত্বরণের মান পেয়েছিলেন ০·২৭ সে.মি./বর্গ সেঃ যা পৃথিবীপৃষ্ঠে পতনশীল বস্তুর ত্বরণের মান ৯৮১ সে.মি./বর্গ সেঃ অপেক্ষা ৩৬৪০ গুণ ছোট। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মাধ্যাকর্ষণের মান পৃথিবী হতে দূরত্বের সাথে কমে যাচ্ছে। কিন্তু কমে যাওয়ার পরিমাণ কোন সূত্র মেনে চলে? পড়ন্ত আপেল ভূ-কেন্দ্র হতে ৬৩৭১ কিলোমিটার দূরে এবং চাঁদ আরও ৩৮৪৪০০ কিলোমিটার দূরে; অর্থাৎ আপেল হতে চাঁদ ৬০·১ গুণ বেশী দূরে। দু'টি অনুপাত ৩৬৪০ ও ৬০·১-এর তুলনা করে নিউটন লক্ষ্য করেন যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির বর্গের প্রায় সমান; তার অর্থ মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটি অত্যন্ত সরল: আকর্ষণ-বল দূরত্বের বিপরীতবর্গীয় নিয়মে কমে যায়।

কিন্তু পৃথিবী যদি আপেল আর চাঁদকে আকর্ষণ করে তাহলে কেন মনে করা যাবে না যে সূর্যও পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহকে আকর্ষণ করে তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করাচ্ছে? তারপর গ্রহদের মধ্যেও আকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকা উচিত যে বল তাদের কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণ বলকে কিছুটা পরিবর্তন করবে। আর যদি তাই হয় তাহলে দু'টি আপেলের মাঝেও আকর্ষণ-বল থাকতে হবে, যদিও বলের মান এত ক্ষুদ্র হবে যে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা তা অনুভব করা সম্ভব নয়। স্পষ্টতঃ এই সর্বজনীন অভিকর্ষ টান অবশ্যই আকর্ষণকারী বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল। নিউটন প্রদত্ত বলবিদ্যার একটি মূল নিয়ম অনুসারে, একটি নির্দিষ্ট বল নির্দিষ্ট কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে বস্তুতে যে ত্বরণের সৃষ্টি করে তা বলের সোজা সমানুপাতিক এবং বস্তুর ভরের বিপরীতানুপাতিক। প্রকৃতপক্ষেও তাই। বস্তুর ভর দ্বিগুণ হলে এতে একক ভরের সমান বেগ সঞ্চার করতে পূর্বের চেষ্টার দ্বিগুণ পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হয়। এজন্যই পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলিও'র প্রাপ্ত ফল—সকল বস্তু মাধ্যাকর্ষণ টানে তাদের ভর-নির্বিশেষে সমান ত্বরণে পতিত হয়—হতে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে আকর্ষণ-বল তাদের ভর অর্থাৎ কিনা ত্বরণ বাধাদান-কারী প্রকৃতির সমানুপাতিক। যদি তাই হয় তাহলে অভিকর্ষ বলকেও বস্তুর ভরের সমানুপাতিক হতে দেখা যাবে। পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝের অভিকর্ষ বল অত্যন্ত বেশী, কারণ উভয় বস্তুই অত্যন্ত ভারী। আপেলের ভর বেশ ক্ষুদ্র পৃথিবী ও আপেলের মধ্যে আকর্ষণ-বল অবশ্যই নগণ্য

banglainternet.com

হবে। এ ধরনের যুক্তির সাহায্যে নিউটন সর্বজনীন অভিকর্ষ সূত্রে উপনীত হন। এই সূত্র অনুসারে দু'টি বস্তু পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে তার মান বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের বিপরীতানুপাতিক। যদি আমরা আকর্ষণকারী বস্তুদ্বয়ের ভরের জন্য M_1, M_2 লিখি এবং তাদের মধ্যেকার দূরত্বকে R দ্বারা নির্দেশ করি—তাহলে অভিকর্ষ ক্রিয়ার বলকে একটা সহজ সূত্রের মাধ্যমে লেখা যায়,

$F = \frac{GM_1M_2}{R^2}$, এখানে G (অভিকর্ষের জন্য) একটি সর্বজনীন ধ্রুবক।

দু'টি আপেলের চেয়ে বেশী বড় নয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটন তাঁর অভিকর্ষ সূত্রের সরাসরি পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ৭৫ বছর পর অন্য এক প্রতিভাবান বৃটিশ বিজ্ঞানী হেনরী ক্যাভেনডিশ সন্দেহাতীতভাবে এই সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। সচরাচর দেখা যায়, এমন আকারের বস্তুর ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রমাণের জন্য ক্যাভেনডিশ যে সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তা তৎকালীন সময়ে যন্ত্রকৌশলের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হলেও আজকাল এটি পদার্থবিদ্যার যে কোন বক্তৃতা-কক্ষে দেখতে পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা নিউটনের অভিকর্ষ নিয়ম উপস্থাপন করে নবীন দর্শকদের মুগ্ধ করা হয়। ক্যাভেনডিশ পাল্লার মূলনীতি ৮নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। পাতলা একটা দণ্ডের দুই প্রান্তে একটি ছোট গোলক যুক্ত করা হয়েছে এবং দণ্ডটি মাকড়সার জালের মতো চিকন লম্বা সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে যেন বায়ুপ্রবাহে এটি আন্দোলিত না হয়। কাঁচের বাক্সের বাইরে দু'টি বড় ভারী গোলক এমনভাবে ঝুলানো হয়েছে যেন গোলক দু'টিকে তাদের কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরানো যায়। গোলকগুলি ভারসাম্যাবস্থায় আসার পর বড় গোলক দু'টির অবস্থান পরিবর্তন করলে দেখা যায় ছোট গোলকসহ দণ্ডটি ভারী গোলকদের আকর্ষণে একটা ক্ষুদ্র কোণে ঘুরে যায়। ঘূর্ণন কোণের মান এবং ঘূর্ণনের জন্য সুতার বাধার পরিমাপ থেকে ক্যাভেনডিশ ছোট গোলকদ্বয়ের উপর বড় গোলকদের আকর্ষণ-বল হিসাব করতে পেরেছিলেন।

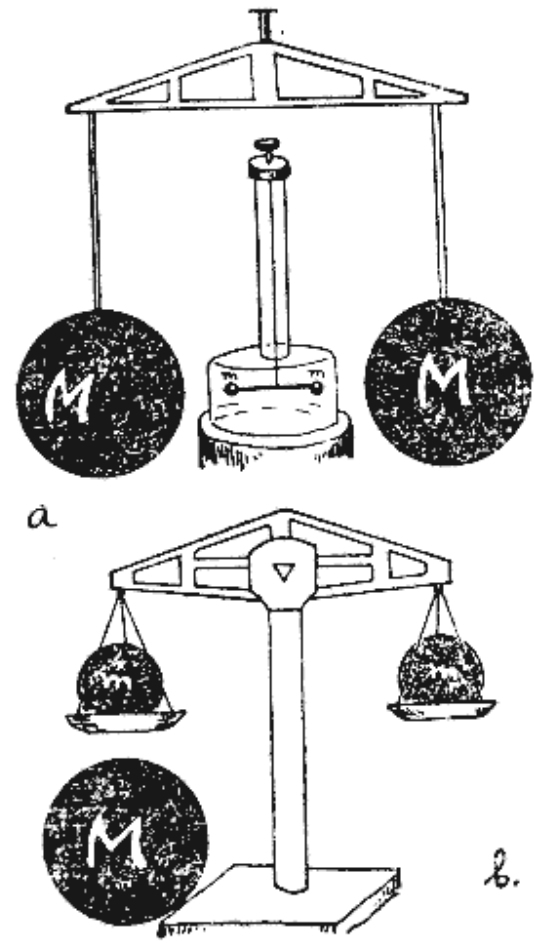

চিত্র ৮. (a) ক্যাভেনডিশ পাল্লার মূলনীতি, এবং (b) বয়েজ-এর পরিবর্তন।

এই পরীক্ষা থেকে তিনি নিউটনের সমীকরণে G এর গাণিতিক মান পেয়েছিলেন 6.66×10^{-8}, যদি দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়কে যথাক্রমে সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ডে মাপা হয়। এই মান ব্যবহার করে যে কেউ দু'টি আপেলের মধ্যেকার আকর্ষণ-বল মাপতে পারে; আকর্ষণ-বল এক আউন্স ওজনের এক বিলিয়ন* ভাগের এক-ভাগ পরিমাণ হবে।

পরবর্তীকালে বৃটিশ পদার্থবিদ সি. ভি. বয়েজ (১৮৫৫-১৯৪৪) সংশোধিতরূপে ক্যাভেনডিশের পরীক্ষাটি করেছিলেন। পাল্লার দুই পাশে দু'টি সমান ওজন স্থাপন করে তিনি পাল্লার এক-পাশের বাটির নিচে একটা ভারী গোলক রাখার খুব ছোট একটা বিক্ষেপ লক্ষ্য করেছিলেন; ছোট ওজনের উপর ভূ-গোলকের আকর্ষণ বড় গোলক বৃদ্ধি করে। প্রাপ্ত বিক্ষেপ হতে বয়েজ বড় গোলক ও পৃথিবীর ভরের অনুপাত নির্ণয়ে সমর্থ হন। তিনি পৃথিবীর ওজন 6×10^{21} কিলোগ্রাম পেয়েছিলেন।

* ১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি

banglainternet.com

তৃতীয় অধ্যায়

ক্যালকুলাস

নিউটন তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রথমদিকে সর্বজনীন অভিকর্ষসূত্রের মৌলিক ধারণাগুলি পাওয়া সত্ত্বেও কেন বিশ বছর ধরে তার প্রকাশ স্থগিত রেখেছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর মনে হয়। তিনি সর্বজনীন অভিকর্ষসূত্রের সম্পূর্ণ গাণিতিক রূপ দিতে সমর্থ হওয়ার পর ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক Philosophical Naturalis Principia Mathematica-তে মতবাদটি প্রকাশ করেন। প্রকাশে এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণ হচ্ছে, যদিও তিনি অভিকর্ষের গোড়ার ভৌত নিয়ম সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছিলেন তথাপি বস্তুদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রয়োগে প্রাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য যে গণিত প্রয়োজন ছিল তা তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তাঁর সময়ের গাণিতিক জ্ঞান বস্তুদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট অভিকর্ষ সমস্যার সমাধানে ছিল অপর্যাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত পৃথিবী-চাঁদের আকর্ষণ বর্ণনার জন্য নিউটনকে ধরে নিতে হয়েছিল যে মাধ্যাকর্ষণ বল বস্তুদ্বয়ের কেন্দ্র-দ্বয়ের মাঝের দূরত্বের বর্গের বিপরীতানুপাতিক। কিন্তু ভূ-গোলক কর্তৃক আপেল আকর্ষণের লব্ধি আকর্ষণ বল অসংখ্য পৃথক আকর্ষণ বলের সমষ্টি; যেমন আপেলবৃক্ষের নিচে, ভূ-ত্বকের বিভিন্ন গভীরতায় অবস্থিত শিলার আকর্ষণ হিমালয় ও রকিপর্বতের শিলাখণ্ডের আকর্ষণ, প্রশান্ত মহাসাগরের পানির আকর্ষণ এবং ভূ-কেন্দ্রের চারপাশে অবস্থিত গলিত লোহার স্তরের আকর্ষণ। যে বল দ্বারা পৃথিবী চাঁদ ও আপেলকে টানে তার অনুপাত নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পূর্বে আলোচিত পদ্ধতিকে গাণিতিক-ভাবে নিখুঁত করার জন্য নিউটনকে দেখাতে হয়েছিল যে ঐ সমস্ত আকর্ষণ-বল মিলে এমন একটিমাত্র আকর্ষণ বল তৈরি করে যা পৃথিবীর সমস্ত ভর তার কেন্দ্রে জমা হয়ে ঐ সমান বল তৈরি করতে পারে। সমস্যাটি গ্যালিলিও'র বস্তুর ক্রমবর্ধিত বেগের সমস্যার মতো, কিন্তু তার চেয়েও জটিল এবং এর সমাধান নিউটনের সময়ে প্রচলিত গণিতের নাগালের

বাইরে ছিল। এ জন্য তাঁকে নিজের প্রয়োজনে গণিতের বিকাশ সাধনে তৎপর হতে হয়েছিল আর তা করতে গিয়েই তিনি যে গণিতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা ক্যালকুলাস বা অন্তরকলন-সমাকলন পদ্ধতি নামে পরিচিত। গণিতের এই শাখা এখন ভৌতবিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য নিশ্চিতভাবে আবশ্যক এবং প্রাণিবিদ্যা বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও দিন দিন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। এর সাথে সনাতন গণিতশাস্ত্রের পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, এখানে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তা পূর্বের জ্যামিতির রেখা, তল ও আয়তনকে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিকরণের পর বিবেচনা করা হয় যদি ক্ষুদ্র অংশগুলি শূন্যের দিকে ধাবিত হয় তাহলে কি ঘটে? আমরা চাঁদের ভ্রমণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে নিউটনের এ ধরনের (১৪ পৃষ্ঠা) যুক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি; সেখানে বাম পার্শ্বের দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদের তুলনায় অগ্রাহ্য করা যাবে যদি আমরা চাঁদের অবস্থান পরিবর্তন শূন্যের কাছাকাছি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য বিবেচনা করি। এ ধরনের যে কোন একটা সহজ গতির উদাহরণ নেওয়া যাক। উদাহরণে গতিশীল বস্তুর স্থানাঙ্ক x সময় t-এর ফাংশন রূপে দেওয়া আছে। সোজা কথায়, এখানে t-এর পরিবর্তনের সাথে x-এর নিয়মিত পরিবর্তন ঘটে। সবচেয়ে সহজ ক্ষেত্রে x, t-এর সমানুপাতিক হতে পারে এবং আমরা লিখতে পারি, $x = At$, যেখানে A হচ্ছে এমন একটা ধ্রুবক যা সমীকরণের উভয় পার্শ্বের সমতা আনয়ন করে।

এই উদাহরণটি নিতান্তই মামুলি। আমরা দু'টি মুহূর্ত t এবং Δt বিবেচনা করি; এখানে সময়বৃদ্ধি Δt কে প্রথমে ক্ষুদ্র ধরে নিয়ে পরে একে শূন্যের সমান করা হবে। এই ক্ষুদ্র সময়ে বস্তু

$$A(t+\Delta t) - At = A\Delta t$$

পথ অতিক্রম করছে। উভয় পার্শ্বকে Δt দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই A। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের Δt কে অতিক্ষুদ্র বিবেচনা করতে হ'ল না; কারণ, Δt উভয় পার্শ্ব থেকে বাদ পড়ল। এভাবে আমরা সময়ের সাথে x-এর পরিবর্তন-হার পাই যাকে নিউটন "Fluxion of x" বা x-এর পরিবর্তন-হার বলে অভিহিত করেছেন:

$$\dot{x} = A$$

banglainternet.com

এখানে x-এর উপরের 'ডট' বা বিন্দু সময়ের সাথে x-এর পরিবর্তন নির্দেশ করে।

এবার এর চেয়ে একটু জটিলতর উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, যেখানে $x = At^2$। পুনরায় x এর মান t এবং $\triangle t$ সময়ে নিয়ে আমরা পাই,

$$A(t + \triangle t)^2 - At^2$$

বন্ধনীমোচন করলে পাওয়া যায়,

$$At^2 + 2At\triangle t + A\triangle t^2 - At^2 = 2At\triangle t + A\triangle t^2$$

রাশিমালাকে $\triangle t$ দ্বারা ভাগ করে দুই পদবিশিষ্ট রাশি $2At + A\triangle t$ পাওয়া গেল। এখন $\triangle t$ শূন্যের কাছাকাছি ক্ষুদ্র হলে শেষ পদটি অদৃশ্য হয় এবং আমরা x-এর 'পরিবর্তন-হার' $x = At^2$ -এর জন্য পাই

$$\dot{x} = 2At$$

এবার $x = At^3$ উদাহরণ নেওয়া যাক। এখানেও আমাদের নির্ণয় করতে হবে : $A(t+\triangle t)^3 - At^3$ এর মান।

$(t+\triangle t)$ কে নিজের সাথে তিনবার গুণ করে At^3 বিয়োগ করলে পাই,

$A(t^3 + 3t^2\triangle t + 3t.\triangle t^2 + \triangle t^3) - At^3 = 3t^2\triangle tA + 3At\triangle t^2 + A\triangle t^3$

এখন $\triangle t$ দ্বারা ভাগ করলে দাঁড়ায় :

$$3At^2 + 3At\triangle t + A\triangle t^2$$

যখন $\triangle t$ এর মান অতি ক্ষুদ্র তখন শেষ দু'টি পদ অদৃশ্য হয় এবং আমরা $x = At^1$-এর ক্ষেত্রে 'পরিবর্তন-হার'-এর জন্য পাই,

$$\dot{x} = 3At^2$$

এমনিভাবে আমরা $x = At^4$, $x = At^5$ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তন-হারগুলি পাব $4At^3$, $5At^4$ ইত্যাদি। অতএব সাধারণ যে নিয়মটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হ'ল : $x = At^n$, যেখানে n একটি অখণ্ড সংখ্যা, সে ক্ষেত্রে x-এর পরিবর্তন-হার হচ্ছে $\dot{x} = n\,At^{n-1}$

উপরের উদাহরণগুলিতে আমরা সময়ের ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি শক্তির সরাসরি অনুপাতে পরিবর্তনশীল রাশি x-এর পরিবর্তন-হার নির্ণয় করলাম। কিন্তু যদি রাশি সময়ের বিভিন্ন শক্তির সাথে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় সে ক্ষেত্রে কি হবে? বীজগণিতের নিয়মানুসারে আমরা

জানি, $t^{-1} = \frac{1}{t}$; $t^{-2} = \frac{1}{t^2}$; $t^{-3} = \frac{1}{t^3}$; ইত্যাদি

এ সকল বিয়োগবোধক শক্তি ব্যবহার করে পূর্বের মতো অগ্রসর হলে

$x = At^{-1}$, $x = At^{-2}$, $x = At^{-3}$ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন হার পাব :

$\dot{x} = At^2$, $\dot{x} = -2At^{-3}$, $\dot{x} = -3At^{-4}$ ইত্যাদি।

এগুলিতে বিয়োগচিহ্ন আসার কারণ হচ্ছে ব্যস্তানুপাতের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল রাশির মান সময়ের সাথে কমে যায় এবং পরিবর্তন-হার হয় ঋণাত্মক। কিন্তু পরিবর্তন-হার নির্ণয়ের নিয়ম অপরিবর্তিত থেকে যায়, যেমন ছিল সরাসরি অনুপাতের ক্ষেত্রে। পরিবর্তন-হার পাওয়ার জন্য আমরা শক্তি-ফাংশনকে তার সূচক-সংখ্যা দ্বারা গুণ করে শক্তির মান এক এককে কমিয়ে দিই। পূর্বে প্রাপ্ত সকল ফল আমরা নিচের ছকে সন্নিবেশিত করি :

$x =$	At^{-3}; At^{-2}; At^{-1}; At; At^2; At^3; At^4; ইত্যাদি
$\dot{x} =$	$-3At^{-4}$; $-2At^{-3}$; $-At^{-2}$; A; $2At$; $3At$; $3At^2$ $4At^3$-ইত্যাদি

নিউটন কর্তৃক ব্যবহৃত চিহ্ন $\dot{x}$, x এর পরিবর্তন-হার নির্দেশ করে এবং $\ddot{x}$ এই পরিবর্তন-হারের পরিবর্তন-হার নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি $x = At^3$ হয় তাহলে $\dot{x} = 3At^2$ এবং $\ddot{x} = \boxed{3At^2} = 3A.2t = 6At$

একইভাবে $\dddot{x}$-এর অর্থ হচ্ছে x-এর পরিবর্তন-হারের পরিবর্তন-হার ও আবার তার পরিবর্তন-হার এবং পূর্বের ক্ষেত্রের জন্য পাই,

$$\dddot{x} = \boxed{\dot{6At}} = 6A$$

এই সহজ নিয়মগুলি এখন আমরা গ্যালিলিও'র পড়ন্ত বস্তুর সূত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করতে পারি। প্রথম অধ্যায়ে আমরা t সময়ে বস্তু কর্তৃক s দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য পেয়েছি, $s = \frac{1}{2}at^2$

banglainternet.com

যেহেতু বেগ v হচ্ছে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হার, এজন্য আমরা পাই,

$$v = \dot{s} = \tfrac{1}{2}a \cdot 2t = at$$

এখানে দেখা যাচ্ছে, বেগ সময়ের সমানুপাতিক। বস্তুর ত্বরণ হচ্ছে তার বেগ-পরিবর্তনের হার (বা তার অবস্থান পরিবর্তন-হারের পরিবর্তন-হার) এবং এর জন্য পাই।

$$a = \ddot{s} = \dot{v} = a$$

অবশ্যই ফলটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিষয়টি পরিত্যাগের পূর্বে একটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার যে, নিউটনের পরিবর্তন-হার চিহ্ন আজকাল পুস্তকে কচিৎ ব্যবহার করা হয়। যে সময়ে নিউটন তাঁর 'পরিবর্তন-হার' পদ্ধতির (বর্তমানে ব্যবকলন নামে পরিচিত) বিকাশ সাধনে তৎপর ছিলেন সে সময়ে জার্মান গণিতবিদ গটফ্রিড ডবলিউ. লাইবনিৎস (Leibnitz) একই বিষয়ে কাজ করছিলেন; অবশ্য তাঁর ব্যবহৃত চিহ্ন ও ভাষা কিছুটা আলাদা ছিল। নিউটন যাকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি 'পরিবর্তন-হার' নামে অভিহিত করেন লাইবনিৎস তাদের প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি অন্তরকলন নাম দেন এবং $\dot{x}$, $\ddot{x}$, $\dddot{x}$ ইত্যাদি লেখার পরিবর্তে লেখেন, $\frac{dx}{dt}$, $\frac{d^2x}{dt^2}$, $\frac{d^3x}{dt^3}$ ইত্যাদি। অবশ্য উভয়ের পদ্ধতির গাণিতিক বিষয়বস্তু ছিল অভিন্ন। যেখানে অন্তরকলন পদ্ধতিতে জ্যামিতিক ক্ষেত্রের অংশগুলি যখন অতিক্ষুদ্র মানের হয় তখন তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে, সেখানে সমাকলন হিসাববিধিতে ঠিক এর উল্টোটি করা হয়: অতিক্ষুদ্র অংশগুলির সমাকলন করে ক্ষেত্রটির পুরো গঠন সম্পন্ন করা হয়। আমরা প্রথম অধ্যায়ে এর সাক্ষাৎ পেয়েছি যেখানে গ্যালিলিও'র পদ্ধতি বর্ণনাকালে অসংখ্য ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যোগ করে একটি ক্ষেত্র পাওয়া গিয়েছিল; ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রগুলি ক্ষুদ্র সময় অন্তরে বস্তুর গতি নির্দেশ করেছিল। শঙ্কু (cone) ও অন্যান্য জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আয়তন নির্ণয়ের জন্য এ ধরনের পদ্ধতি গ্যালিলিও'র পূর্বে গ্রীক গণিতবিদরা ব্যবহার করেছিলেন, যদিও অনুরূপ ধরনের সমস্যার সমাধানে এই পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার তখন জানা ছিল না।

অন্তরকলন ও সমাকলন পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য এখানে একটি বিন্দুর গতি আলোচনা করা যেতে পারে। বিন্দুর

চিত্র ৯. সমাকলন (a) ঐকিক ফাংশন; (b) দ্বিঘাত ফাংশন; ত্রিঘাত ফাংশন।

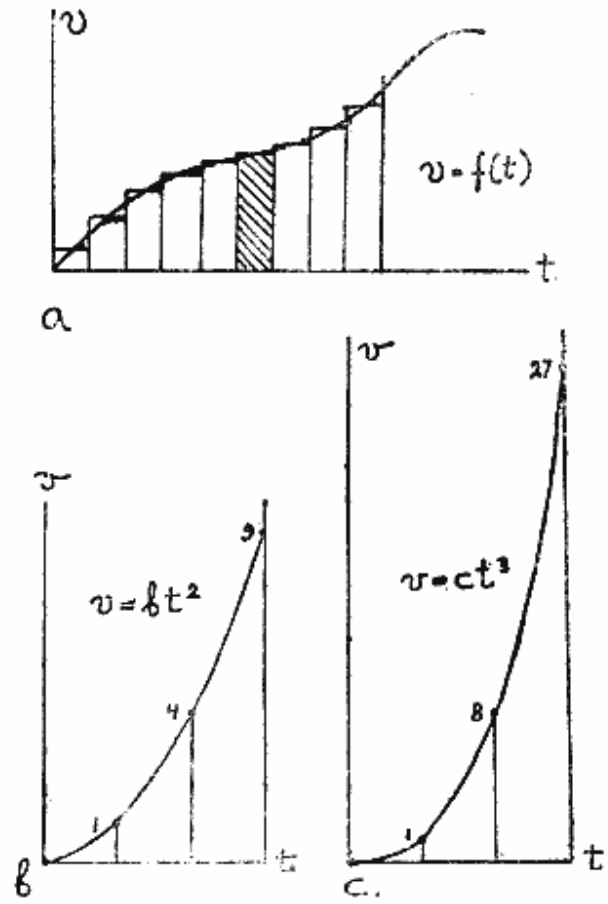

বেগ v সময় t-এর ফাংশন v(t) চিত্র ৯ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। চিত্র ৩-এ প্রদর্শিত বিষয়ের ক্ষেত্রে যে ধরনের যুক্তি দেওয়া হয়েছিল ঠিক সে প্রকারের যুক্তি দিয়ে আমরা বলতে পারি t সময়ে বিন্দু কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব s, বেগরেখার নিচের ক্ষেত্রফল দ্বারা নির্দেশ করা যায়। কোন

banglainternet.com

বিশেষ মুহূর্তে s-এর পরিবর্তনের হার সে মুহূর্তের বেগ নির্দেশ করে, এজন্য আমরা নিউটন ও লাইবনিৎস অনুসরণ করে লিখতে পারি :

$$\dot{s} = v \quad \text{বা} \quad \frac{ds}{dt} = v$$

সুতরাং v যদি সময় t-এর কাংশন হিসাবে দেওয়া থাকে তাহলে s অবশ্যই সময়ের এমন কাংশন হবে যে, এর পরিবর্তন-হার বা অন্তরকলন v এর সমান হবে। সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর জন্য : $v = at$, এজন্য আমাদের সময়ের এমন কাংশন নির্ণয় করতে হবে যেন তার পরিবর্তন-হার at-এর সমান হয়। ২৩ পৃষ্ঠার ছক থেকে আমরা দেখতে পাই যে, At^2-এর পরিবর্তন-হার $2At$; কজেই $\frac{1}{2}At^2$-এর অন্তরকলন At-এর সমান। এভাবে আমরা পাই $s = \frac{1}{2}at^2$, এখানে A-এর পরিবর্তে a লেখা হয়েছে। গ্যালিলিও জ্যামিতির সাহায্যে ঠিক এই একই ফলে উপনীত হয়েছিলেন।

এখন আরো দু'টি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এর একটি ক্ষেত্রে বেগ সময়ের বর্গের অনুপাতে এবং অন্যটির ক্ষেত্রে বেগ সময়ের 'ঘন' অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এ দু'টির জন্য আমাদের অবশ্যই লিখতে হবে,

$$v = bt^2 \quad \text{এবং} \quad v = ct^3$$

এ দু'টির লেখচিত্র ৯ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে এবং পূর্বের উদাহরণের মতো অতিক্রান্ত দূরত্বরেখার নিচের ক্ষেত্রফল দ্বারা নির্দেশিত হয়। কিন্তু যেহেতু এ সকল ক্ষেত্রে রেখা সরল নয় এ জন্য কোন সহজ জ্যামিতিক নিয়মে এদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নিউটনের পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য ২৩ পৃষ্ঠার ছকের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে At^3 ও At^4-এর জাতরাশি হচ্ছে (derivative) $3At^2$ ও $4At^3$; জাতরাশিগুলি বেগের রাশির মতোই, পার্থক্য শুধু তাদের সহগে। এভাবে $3A = b$ এবং $4A = c$ ধরে রেখার অন্তর্গত ক্ষেত্রফলের মান পাওয়া যায়,

$$s_b = \frac{1}{3}bt^3 \quad \text{এবং} \quad s_c = \frac{1}{4}ct^4$$

পদ্ধতিটি সাবিকভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং যে কোন শক্তির t-এর জন্য

প্রযোজ্য হওয়া ছাড়াও আরও জটিল সম্বন্ধ যেমন,

$V = at + bt^2 + ct^3$-এর জন্যও প্রয়োগ করা যায়।

এর জন্য আমরা পাই, $s = \frac{1}{2}at^2 + \frac{1}{3}bt^3 + \frac{1}{4}ct^4$

এই আলোচনা হতে লক্ষ্য করা যায় যে সমাকলন পদ্ধতি অন্তরকলনের ঠিক বিপরীত ; এখানে এমন অজানা ফাংশন খুঁজতে হয় যার জাতরাশি একটি নির্দিষ্ট প্রদত্ত ফাংশনের সমান। এজন্য আমরা ২৩ পৃষ্ঠার ছকের সারি দু'টিকে বিনিময় করে এবং আংকিক সহগগুলিকে পরিবর্তন করে লিখি :

$\dot{x} =$	At^{-4} ; At^{-3}; At^{-2} ; A ; At ; At^2 At^3 ; ইত্যাদি
$x =$	$-\frac{A}{3}t^{-3}, -\frac{A}{2}t^{-2}; -At^{-1}$; At; $\frac{A}{2}t^2$; $\frac{A}{3}t^3$; $\frac{A}{4}t^4$; ইত্যাদি

আমরা বলি যে x হচ্ছে $\dot{x}$-এর সমাকলন। নিউটনের চিহ্ন অনুসরণ করে লেখা যায়, $x = (\dot{x})^{\cdot}$ যেখানে x-এর মাথার ডট ও ড্যাশ পরস্পরকে কাটাকাটি করে। লাইবনিৎস-এর চিহ্ন অনুসরণে লেখা হয়, $x = \int \dot{x}dt$,

এখানে ডান পাশের প্রথম চিহ্নটি লম্বা হয়ে যাওয়া S ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটি sum বা যোগ অর্থ নির্দেশ করে।

এখন এই নতুন ছকটি সমত্বরণ গতির পুরাতন দৃষ্টান্তে ব্যবহার করা যাক। ত্বরণ সমান থাকে বলে আমরা লিখি,

$$\ddot{x} = a \quad \text{বা,} \quad \boxed{\dot{x}} = a$$

এখান থেকে পাওয়া যায় : $\dot{x} = \int a dt = at$

দ্বিতীয়বারের মতো সমাকলন করলে নতুন ছকের সাহায্যে পাওয়া যায়,

$$x = \int at.\, dt = \frac{a}{2}t^2$$

অর্থাৎ পূর্বের পাওয়া সেই একই ফল। যদি ত্বরণ সমান না থেকে সময়ের

banglainternet.com

সমানুপতিক হয় তাহলে পাওয়া যায়

$$\ddot{x} = bt$$

$$\dot{x} = \int bt\,dt = \frac{1}{2}b^2$$

$$x = \int \frac{1}{2} bt^2 dt = \frac{b}{2}\int t^2\,dt = \frac{b}{6}t^3$$

এ ক্ষেত্রে গতিশীল বস্তু দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের 'ঘন'-এর সাথে বৃদ্ধি পায়।

সমাকলন ও অন্তরকলন পদ্ধতির এই প্রাথমিক আলোচনাকে তিন-মাত্রার ক্ষেত্রে, যেখানে স্থানাঙ্ক x, y, z বিদ্যমান, প্রয়োগ করা যাবে। যে সব পাঠক বর্তমান আলোচনা সহজে বুঝতে পারছেন তাঁদের উপর সে বিষয়ের ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা সে আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

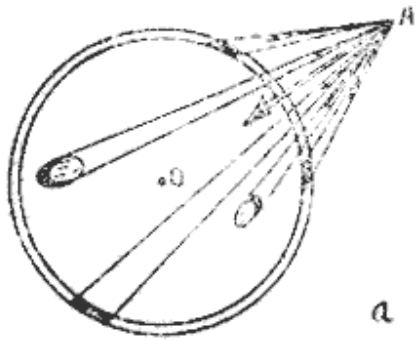

a

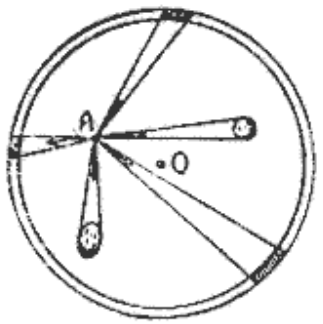

b

চিত্র ১০ (a) বহির্বিস্তৃত কর্তুলাকার খোলকের মহাকর্ষ বল; (b) একই বল, বহির্বিশ্ব পরিণতে অভ্যন্তরে।

সমাকলন-অন্তরলন পদ্ধতির মূল নীতিগুলির বিকাশ করার পর নিউটন তাদের সর্বজনীন অভিকর্ষ মতবাদের প্রতিবন্ধকসমূহ অপসারণের জন্য প্রয়োগ করেন; প্রথমত পৃথিবী কর্তৃক তার কেন্দ্র হতে যে কোন দূরত্বে ক্ষুদ্র বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণ টানের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি পৃথিবীকে অনেকগুলি এককেন্দ্রিক খোলকে (shell) বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক খোলকের অভিকর্ষ টানকে

banglainternet.com

পৃথক পৃথকভাবে (চিত্র ১০) বিচার করেন। সমাকলন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য আমাদের প্রত্যেক খোলকের (shell) তলকে সমান ক্ষেত্রফলের অসংখ্য ক্ষুদ্র তলে বিভক্ত করে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষেত্র 'O' বস্তুকে যে বিপরীত বর্গ নিয়মে আকর্ষণ করে তার মান হিসাব করা প্রয়োজন। এভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা 'O' গামী অসংখ্য বল ভেক্টর পাব যাদের সমাকলন ভেক্টর যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা করা যাবে। বিষয়টির যথাযথ হিসাব আমরা প্রাথমিকভাবে যে আলোচনা করেছি তার দ্বারা সম্ভব না হলেও নিউটন এর সমাধান করতে সমর্থ হন। প্রাপ্ত ফলটি এরকম: O বিন্দু যখন খোলকের বাইরে তখন সকল ভেক্টর মিলিত হয়ে এমন একটি ভেক্টর তৈরি করে যা খোলকের সম্পূর্ণ ভর তার কেন্দ্রে জমা হলে তৈরি করত। আর O বিন্দু খোলকের অভ্যন্তরে হলে সকল ভেক্টরের যোগফল শূন্য হ'ত এবং কোন অভিকর্ষ টান বস্তুর উপরে কাজ করত না। পৃথিবীর আপেল আকর্ষণ সমস্যার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি এই ফলের সাহায্যে করা যায় এবং এভাবেই যুবক নিউটন লিঙ্কনশায়ারের খামার বাগানে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় যে অভিকর্ষ সূত্রের সূত্রপাত করেন তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রহসমূহের কক্ষপথ

ক্যালকুলাস সম্পর্কে আমরা এখন কিছু জ্ঞান লাভ করেছি; আমাদের এই লব্ধ জ্ঞানকে এখন অভিকর্ষ টানে গতিশীল স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নভোমণ্ডলীয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করতে পারি। একটি রকেট কত দ্রুত নিক্ষেপ করা হলে তা পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়িয়ে চলে যেতে পারবে? আমরা প্রথমে সে হিসাব করতে চাই। ধরা যাক, কয়েকজন লোক একটি বিরাট পিয়ানো রাস্তার তল থেকে একটি বহুতল বাড়ির কোন নির্দিষ্ট তলায় উঠাবে। সকলেই (বিশেষ করে যাঁরা পিয়ানো তুলছেন) এ বিষয়ে একমত হবেন যে একতলায় তুলতে যে কাজ করতে হয় তিনতলায় তার তিনগুণ বেশী কাজ করতে হবে। ভারী আসবাবপত্র উঠাতে কাজের পরিমাণ ভরের অনুপাতেও বৃদ্ধি পায় এবং ছ'টি চেয়ার উঠাতে একটি চেয়ার উঠানোর ছয়গুণ বেশী কাজ করতে হয়।

অবশ্যই এগুলি খুব সাধারণ ব্যাপার এবং একটি রকেট বেশ উঁচুতে উঠিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে বা চাঁদের পৃষ্ঠে স্থাপনের মতো উঁচুতে হলে কি পরিমাণ কাজ করতে হবে? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অভিকর্ষ টান পৃথিবীর কেন্দ্র হতে দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে কমতে থাকে; যত বেশী উঁচুতে আমরা বস্তুকে উঠাব, আরও বেশী উঠানোর কাজ তত সহজ হতে থাকবে।

১১ নং চিত্রে পৃথিবীর কেন্দ্র হতে দূরত্বের সাথে অভিকর্ষের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। কোন বস্তুকে পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে (কেন্দ্র হতে R_0 দূরত্বে অবস্থিত) R দূরত্ব পর্যন্ত উঠাতে প্রয়োজনীয় মোট কাজ নির্ণয়ের জন্য আমাদের উর্ধ্বদিকে অভিকর্ষের ক্রম হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে R_0 হতে R দূরত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশ dr-এ বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের জন্য কাজের পরিমাণ নির্ণয় আবশ্যক। যেহেতু উচ্চতার জন্য তারতম্যের জন্য অভিকর্ষ মোটামুটিভাবে স্থির (আসবাবপত্র সরানোর বিষয়টি স্মরণ করুন) ধরা যেতে পার, অতএব আমরা কাজের পরিমাণ বস্তুকে উঠানোর বলকে

উত্থিত দূরত্ব দ্বারা গুণ করে অর্থাৎ ১১ নং চিত্রের রেখাঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে পাই। ক্ষুদ্র সরণকে শূন্য সীমার নিকটবর্তী

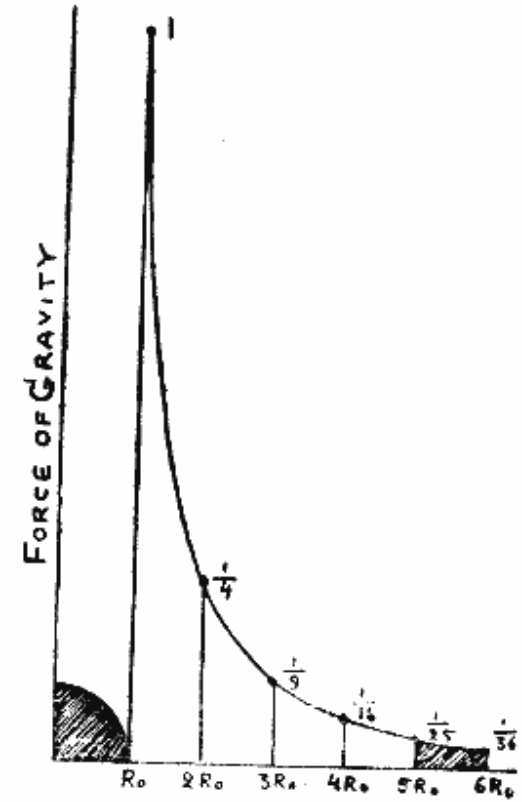

চিত্র ১১. দূরত্বের সাথে অভিকর্ষ বল-হ্রাস (R_0 পৃথিবীর ব্যাসার্ধ)।

করে আমরা বলতে পারি যে একটি বস্তুকে R_0 হতে R উচ্চতায় উঠাতে মোট কাজের পরিমাণ, আকর্ষণ বল চিহ্নিতকারী রেখার অন্তর্গত ক্ষেত্রফলের সমান বা পূর্বের অধ্যায়ের চিহ্নের সাহায্যে, সমাকলন:

$$W = \int_{R_0}^{R} G\frac{Mm}{r^2}\,dr = G\,Mm\int_{R_0}^{R}\frac{1}{r^2}\,dr$$

banglainternet.com

(স্থির মানের রাশি সমাকলন পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয় না বলে আমরা GMm কে সমাকলন চিহ্নের বাইরে এনেছি; সমাকলনের চূড়ান্ত ফলকে এটা দ্বারা গুণ করা হবে।) ২৭ পৃষ্ঠার ছক থেকে আমরা দেখতে পাই যে $\frac{1}{r^2}$ এর সমাকলিত ফল হচ্ছে $-\frac{1}{r}$ (যেহেতু $\frac{1}{r}$ জাতরাশি হচ্ছে $-\frac{1}{r^2}$) অতএব কাজের পরিমাণ হচ্ছে :

$$W = -G\frac{Mm}{R} - \left(-G\frac{Mm}{R_o}\right) = GMm\left(\frac{1}{R_o} - \frac{1}{R}\right)$$

সম্বন্ধ $P_R = -\frac{GM}{R}$কে (একক ভরের বস্তুকে উঠানোর সাথে সম্পর্কযুক্ত) মাধ্যাকর্ষণ বিভব বলা হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে, একক ভরকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠাতে কাজের পরিমাণ, এ দুই জায়গায় বিভব-পার্থক্যের সমান।

এ ধরনের ছোটখাট ব্যাপার তথ্যানুসন্ধানের প্রথমদিকেই নিউটনের জানা ছিল। কিন্তু তাঁর অর্ধশতাব্দী পূর্বে জার্মান জ্যোতির্বিদ যোহানস্ কেপলার সূর্যের চারপাশে গ্রহদের এবং গ্রহের চারধারে উপগ্রহদের আবর্তনের যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে যান সেগুলির ব্যাখ্যার মতো কঠিন কাজের মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়। তুলনামূলকভাবে স্থির নক্ষত্রের চার পাশে গ্রহগুলির গতির নিরীক্ষাকালে কেপলার তাঁর শিক্ষক টাইকো ব্রাহের প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের সাহায্য পান। কেপলার লক্ষ্য করেন যে, সকল গ্রহ সূর্যকে দুই উপকেন্দ্রের একটিকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ এভাবে উপবৃত্তের সংজ্ঞা দেন: শঙ্কুর অক্ষের সাথে হেলানো কোন তল শঙ্কুকে যে তলে ছেদ করে তার প্রস্থচ্ছেদই হচ্ছে উপবৃত্ত। ছেদকারী তল যত বেশী হেলানো থাকবে উপবৃত্তও তত দীর্ঘ হবে। তল যদি অক্ষের উপর লম্ব হয় তাহলে উপবৃত্তটি একটি বৃত্তের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সংজ্ঞার সমতুল্য আরেকটি সংজ্ঞা হচ্ছে, উপবৃত্ত এমন একটি আবদ্ধ ক্ষেত্র যার পরিধির উপরে কোন বিন্দু ক্ষেত্রের দীর্ঘ অক্ষের উপর অবস্থিত দু'টি কেন্দ্র হতে সকল সময় সমান দূরে থাকে। উপবৃত্তের এই

সংজ্ঞা থেকে দু'টি পিন এবং এক টুকরা সুতার সাহায্যে সহজে চিত্র ১২-এর মতো ক্ষেত্রটি আঁকা যায়।

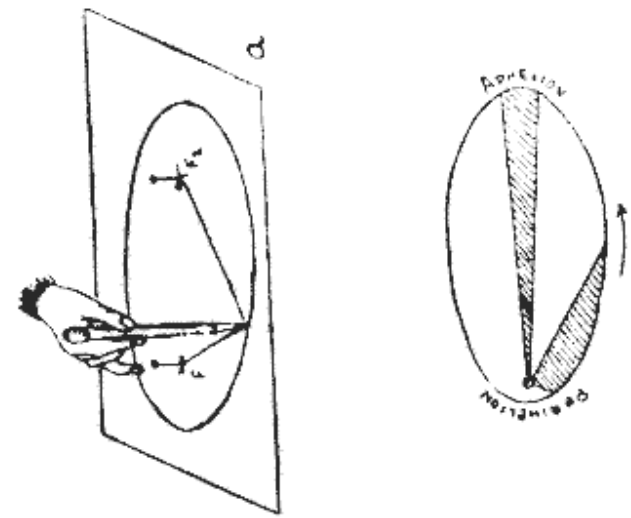

চিত্র ১২. (a) উপবৃত্ত আঁকার সহজ পদ্ধতি ; (b) কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র।

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র বলে যে, উপবৃত্তাকার পথে গ্রহসমূহের ভ্রমণ পথ এমন হয় যে সূর্য ও গ্রহের মধ্যে সংযোগকারী কোন কাল্পনিক রেখা সমান সময়ে গ্রহদের কক্ষপথের সমান ক্ষেত্র তৈরি করে (চিত্র ১২)।

সবশেষে তৃতীয় সূত্র, যেটি ন' বছর পর কেপলার প্রকাশ করেছিলেন। এই সূত্র অনুসারে, সকল গ্রহের প্রদক্ষিণকালের বর্গের অনুপাত তাদের সূর্য হতে গড় দূরত্বের 'ঘন'-এর অনুপাতের সমান। উদাহরণস্বরূপ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের দূরত্ব সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্বের এককে (যাকে দূরত্বের জ্যোতিষ এককও বলা হয়) যথাক্রমে ০·৩৮৭, ০·৭২৩, ১.৫২৪, ৫.২০৩ এবং তাদের প্রদক্ষিণকাল যথাক্রমে ০·২৪১, ০·৬১৫, ১.৮৮১ এবং ১১.৮৬০ বছর। এখন প্রথমোক্ত সংখ্যাগুলির (দূরত্ব) ঘন করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় পরের সংখ্যাগুলির (প্রদক্ষিণকাল) বর্গ করলে সেই একই সংখ্যা পাওয়া যায়, যেমন ০.০৬৪০, ০·৩৭৮৫, ৩.৫৩৯৬ এবং ১৪০.৮৫।

গবেষণার প্রথমদিকে নিউটন সাদৃশ্যের খাতিরে চাঁদের কক্ষপথকে পুরোপুরি বৃত্তাকার ধরেছিলেন এবং এভাবে ধরে নেওয়ার ফলে ইতিপূর্বে

banglainternet.com

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত অভিকর্ষ-সূত্র সহজরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম ধাপ অতিক্রমের পর তাঁকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, যদি অভিকর্ষ-সূত্র সঠিক হয় তাহলে গ্রহদের কক্ষপথ বৃত্ত হতে ভ্রষ্ট হয়ে উপবৃত্তাকার রূপ পরিগ্রহ করবে যার এক কেন্দ্রে অবস্থান করবে সূর্য। একই উক্তি চন্দ্রের জন্যও প্রযোজ্য, কারণ এর কক্ষপথ পুরোপুরি বৃত্তাকার নয়, বরং উপবৃত্তাকার। নিউটন সমাতন জ্যামিতির শুধুমাত্র বৃত্ত ও সরলরেখার ধারণা দিয়ে এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্যাটির সমাধানের জন্যই তিনি অন্তরকলন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। পূর্বের অধ্যায়ে অন্তরকলনের যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তার দ্বারা গ্রহদের পথ যে উপবৃত্তাকার হবে সে সম্পর্কে নিউটনের প্রমাণের আলোচনা করা সম্ভব নয়, কিন্তু আশা করা যায় এর দ্বারা পাঠকগণ অন্তত এটুকু বুঝতে সমর্থ হবেন কি করে নিউটন সমস্যাটির সমাধানে অগ্রসর হয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কক্ষপথ OO'-এ v বেগে গতিশীল একটি গ্রহের গতি আমরা ১৩ নং চিত্রে দেখিয়েছি। এরূপ গতির ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে গ্রহের অবস্থান সূর্য হতে এর দূরত্ব r এবং সূর্যের

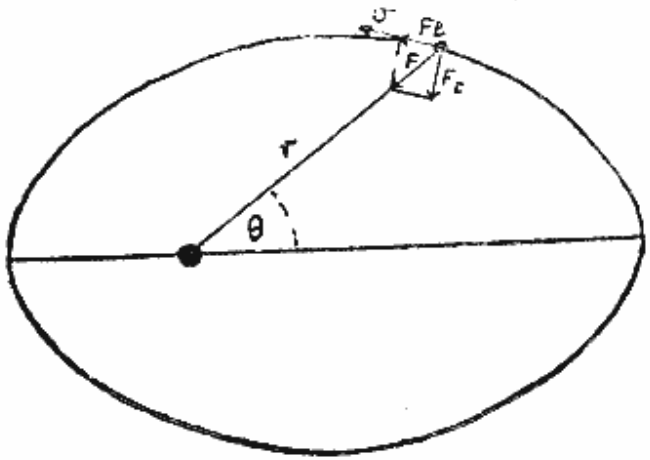

চিত্র ১৩. উপবৃত্তাকার কক্ষপথ বরাবর গ্রহের গতির উপর ক্রিয়ারত বলসমূহ।

সাথে তার সংযোগকারী রেখা (ব্যাসার্ধ ভেক্টর) নির্দিষ্ট কোন দিক, ধরা যাক, উপবৃত্তাকার তলে অবস্থানকারী কোন স্থির নক্ষত্রের দিকের সাথে যে কোণ θ করে তার দ্বারা নির্দেশ করা সুবিধাজনক। গ্রহের অবস্থান

স্থানাঙ্ক r ও θ; কিন্তু তার অবস্থান পরিবর্তনের হার পাওয়া যাবে $\dot{r}$ ও $\dot{\theta}$ দ্বারা এবং পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন-হার (অর্থাৎ ত্বরণ) পাওয়া যাবে দ্বিতীয় পরিবর্তন-হার $\ddot{r}$ এবং $\ddot{\theta}$ দ্বারা। গ্রহের উপর মাধ্যাকর্ষণ বল $F=\frac{GMm}{r^2}$ সাধারণভাবে কক্ষতলের লম্ব বরাবর নয়, যেমনটি বৃত্তপথে গতির জন্য হয়ে থাকে। এজন্য আমরা বলের যোগ নিয়ম ব্যবহার করে বেগকে দু'টি অংশে ভাগ করি: একভাগ Fl যার দিক কক্ষপথ বরাবর এবং অন্য ভাগ Fl যার দিক পূর্বের ভাগের লম্ব বরাবর।*

এরপর নিউটনের বলবিদ্যার মূল সূত্র —কোন দিক ত্বরণের মান ঐ দিক বরাবর কার্যকরী বলের সমানুপাতিক—ব্যবহার করে গ্রহের গতির অন্তরকলন সমীকরণ পাওয়া যায়। এসব সমীকরণ স্থানাঙ্ক r, θ, তাদের প্রথম পরিবর্তন-হার $\dot{r}$, $\dot{\theta}$ এবং দ্বিতীয় পরিবর্তন-হার $\ddot{r}$, $\ddot{\theta}$-এর মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। এরপরের কাজ শুধুমাত্র গণিতের সাহায্যে হিসাব করা —r এবং θ কিভাবে সময়ের উপর নির্ভর করে যেন তারা নিজেরা এবং তাদের প্রথম পরিবর্তন-হার, দ্বিতীয় পরিবর্তন-হার অন্তরকলন সমীকরণগুলিকে সিদ্ধ করে। প্রাপ্ত উত্তর হতে দেখা যাবে, বেগ অবশ্যই এমন একটি উপবৃত্তাকার পথে হতে থাকবে যার একটি কেন্দ্রে সূর্য অবস্থান করে এবং ব্যাসার্ধ ভেক্টর সমান সময়ে সমান ক্ষেত্র তৈরি করে।

এখানে আমরা যদিও কেপলারের প্রথম দু'টি সূত্রজাত বিষয়ের শুধুমাত্র 'বর্ণনামূলক' আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছি, তবু তৃতীয় সূত্রের সঠিক প্রতিষ্ঠা বৃত্তাকার কক্ষপথের উপর ভিত্তি করে করতে আমরা সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে, বৃত্তপথে গতির কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ হচ্ছে (কেন্দ্রের দিকে) v^2/R, যেখানে v বস্তুর বেগ এবং R তার কক্ষপথের ব্যাসার্ধ। যেহেতু কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণকে বস্তুর ভর দ্বারা গুণ করলে মাধ্যাকর্ষণ বল পাওয়া যাবে, এজন্য আমরা লিখি:

$$\frac{mv^2}{R}=\frac{GMm}{R^2}$$

* l এবং t সূচক দু'টি যথাক্রমে লম্ব ও ছেদক দিক নির্দেশ করে।

banglainternet.com

অপরদিকে, বৃত্তকার কক্ষপথের দৈর্ঘ্য $2\pi R$ হওয়ায় একবার প্রদক্ষিনের সময় পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত সূত্র

$$T = \frac{2\pi R}{v}\text{-এর সাহায্যে।}$$

এখান থেকে আমরা পাই,

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

প্রথম সমীকরণটিতে এই মান বসিয়ে আমরা পাই,

$$\frac{m4\pi^2R^2}{T^2R} = \frac{GMm}{R^2}$$

সামান্য রদবদলের পর এবং m কে দু'পাশ থেকে বাদ দিয়ে আমরা পাই,

$$4\pi^2R^3 = GMT^2$$

ব্যস! কাজ শেষ। যা কিছু পাওয়ার ছিল তা সব এই সূত্রেই আছে। সূত্র অনুসারে R-এর মান T-এর বর্গের সমানুপাতিক এবং এটাই কেপলারের তৃতীয় সূত্র।

ক্যালকুলাস পদ্ধতির ব্যাপকতর প্রয়োগে দেখানো যায় যে, এই একই সূত্র সঠিক উপবৃত্তাকার কক্ষপথের জন্যও প্রযোজ্য হয়।

এভাবেই নিউটন তাঁর সমস্যার সমাধান-উপযোগী গণিত আবিষ্কার করে দেখাতে সমর্থ হন যে গৌরপরিবারের সদস্যরা তাঁর সর্বজনীন অভিকর্ষ-সূত্র মেনে চলে।

পঞ্চম অধ্যায়

পৃথিবী ঃ একটি ঘূর্ণমান লাট্টিম

পৃথিবীর আকর্ষণ কিরূপে চাঁদকে তার কক্ষপথে ধরে রাখে এবং কিভাবে সূর্যের আকর্ষণ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহকে উপবৃত্তাকার পথে নিজের চারপাশে পরিভ্রমণ করায়, এসকল প্রশ্নের সমাধানের পর নিউটন ভূ-গোলকের মাঝামাঝি অক্ষের চারধারে ঘূর্ণনের উপর এই দুই মহাকাশীয় বস্তুর প্রভাবের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবীর অক্ষকেন্দ্রিক ঘূর্ণনের ফলে এর আকার নিশ্চয়ই একটা চেপে যাওয়া গোলকের মতো হবে কারণ নিরক্ষ এলাকার মাধ্যাকর্ষণ টান কেন্দ্রাতিগ বল দ্বারা কিছুটা পূরণ হয়। বাস্তবিক পক্ষে ঘটেও তাই, কারণ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নিরক্ষরেখা বরাবর মেরু অঞ্চলের চেয়ে ১৩ মাইল বেশী এবং অভিকর্ষজনিত ত্বরণ নিরক্ষ অঞ্চলে মেরু অঞ্চল অপেক্ষা ০·৩ শতাংশ কম। সুতরাং পৃথিবীকে মনে করা যায় একটি গোলক যা নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্ফীত; স্ফীতির পরিমাণ বিষুবীয় অঞ্চলে ১৩ মাইলের মতো এবং মেরু অঞ্চলে শূন্য। পৃথিবীর গোলাকার অংশের পদার্থের উপর সূর্য ও চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রযুক্ত একটি বলের সমতুল্য হলেও নিরক্ষীয় স্ফীতির উপর আকর্ষণ বল ঠিক এভাবে কাজ করে না। যেহেতু আকর্ষণ দূরত্বের সাথে কমে সেজন্য স্ফীত অংশের যে ভাগ আকর্ষণকারী বস্তুর (সূর্য ও চাঁদ) দিকে থাকে তার উপর আকর্ষণ বল F, উল্টো দিকের চেয়ে বেশী। ফলে একটা টর্ক বা মোচড় দেওয়া বলের অস্তিত্ব দেখা যায় যা পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষকে সোজা করতে চেষ্টা করে যেন অক্ষটি পৃথিবীর অক্ষতলের (উপবৃত্ত) বা চন্দ্রের অক্ষতলের উপর লম্ব হয়। কিন্তু এসব বলের প্রভাবে ঘূর্ণন-অক্ষের গতি যেমন হওয়া উচিত তেমনটি হয় না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের ভূ-গোলক তার গতির দিক দিয়ে বিরাট বড় একটা ঘূর্ণমান লাট্টিমের মতো; মজার খেলনা হিসেবে যার সাথে আমরা শিশুকাল থেকে পরিচিত।

banglainternet.com

লাট্টিম যখন দ্রুত ঘোরে তখন এটা মাটিতে পড়ে যায় না, যদিও এর পড়ে যাওয়াই উচিত; পরিবর্তে এটা মেরোর সাথে একটা কোণে হেলে

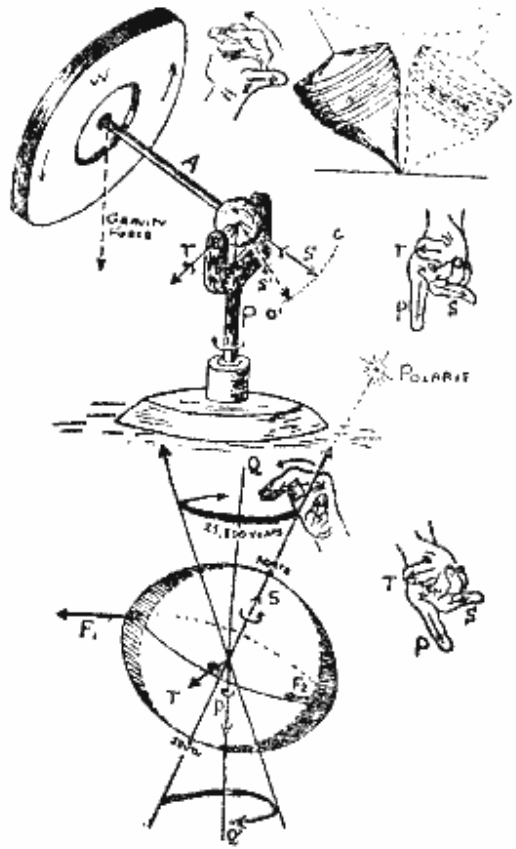

চিত্র ১৪. আবর্তনরত জাইরো ও আবর্তনরত পৃথিবী।

থাকে এবং ঘূর্ণনকালে ঘূর্ণন অক্ষ উল্লম্ব দিকের চারপাশে একটি বিস্তৃত শঙ্কু সৃষ্টি করে (১৪ নং চিত্রের উপরের ডান কোণায়)। কেবলমাত্র ঘর্ষণের জন্য লাট্টিমের ঘূর্ণন ধীরে ধীরে কমে আসে এবং তা মেঝেয় পড়ে গড়িয়ে গোকার নিচে চলে যায়। ঘূর্ণমান লাট্টিমের আরও একটু বিস্তৃততর মডেল ১৪ নং চিত্রের উপরের অর্ধাংশে দেখান হয়েছে; এটি উল্লম্ব

অক্ষের চারধারে ঘূর্ণনক্ষম একটি কাঁটার খুঁটি, কাঁটাটি একটি দণ্ড A কে আটকে রেখেছে যা আটকানো বিন্দুর চারপাশে মুক্তভাবে উপরে-নিচে যেতে পারে। দণ্ডের মুক্তপ্রান্তে একটি ফ্লাইহুইল W এমনভাবে আটকানো থাকে যেন বলবিয়ারিং-এর সাথে সামান্য ঘর্ষণ করে তা ঘুরতে পারে। চাকা যখন ঘোরে না তখন সাধারণ অবস্থা হচ্ছে, দণ্ডটি নিচে নেমে আসে এবং চাকা টেবিলের উপর ঠেস দিয়ে থাকে। কিন্তু যদি চাকাটি দ্রুত ঘুরানো হয় তাহলে এমন কিছু ঘটবে যা পূর্বে দেখেননি এমন ব্যক্তির কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে; চাকাসহ দণ্ডটি নিচে পড়বে না এবং যতক্ষণ চাকার গতি অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ চাকা, দণ্ড তার-কাঁটার খুঁটিসহ একটি উল্লম্ব অক্ষের চারপাশে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে। এই হচ্ছে অতিপরিচিত জাইরোস্কোপের মূলনীতি। এর অনেক ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে যার মধ্যে মহাসমুদ্রে জাহাজ এবং আকাশে উড়োজাহাজ ঠিকভাবে চালানোর কাজ অন্যতম; খারাপ আবহাওয়ায় দোলন ও ঝাঁকুনি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাইরোস্কোপ স্থিতক রূপে ব্যবহৃত হয়।

সম্ভবত জাইরোস্কোপের সবচেয়ে চমৎকার ব্যবহার করেন জাঁ-পেরিন নামে একজন ফরাসী পদার্থবিদ। তিনি একটি গতিশীল বিমানজাইরো সুটকেসে ভরে প্যারিস রেল স্টেশন থেকে (সে সময় বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল না) রেলযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যখন একজন ফরাসী কুলি সুটকেসটি নিয়ে চলতে চলতে বাঁক নিতে গেল তখন বাহিত সুটকেসটি তার সাথে মোড় নিতে অস্বীকার করল। বিস্মিত কুলিটি এবার বল প্রয়োগ করলে সুটকেসটি তার হাতে মোচড় দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে (চিত্র-১৫) গেল। হতভম্ব কুলি তখন ফরাসী ভাষায় "নিশ্চয় এর ভিতর শয়তান আছে" চীৎকার দিয়ে সুটকেসটি ফেলে পালিয়ে গেল। এ ঘটনার এক বছর পর পেরিন নোবেল পুরস্কার পেলেন, না,—তাঁর জাইরো পরীক্ষার জন্য নয়, অণুর তাপীয় গতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য।

জাইরোস্কোপের বিচিত্র ব্যবহার বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই ঘূর্ণন গতির ভেক্টর বর্ণনার সাথে পরিচিত হতে হবে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে রৈখিক গতির বেগকে বেগের দিকে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে (ভেক্টর) বেগের মানের সমানুপাতিক সরলরেখার দৈর্ঘ্য দ্বারা নির্দেশ

banglainternet.com

করা হয়। ঘূর্ণনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। এক্ষেত্রে ঘূর্ণনের অক্ষ বরাবর তীরচিহ্ন দেওয়া হয় এবং তীরের দৈর্ঘ্য কৌণিক

চিত্র ১৫. পেঁয়াজ-এর পরীক্ষা।

বেগের মান নির্দেশ করে, প্রতিমিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা বা আর কোন এককের সমতুল্য গ্রহণ করা হয়। তীরচিহ্নের দিক ঠিক করা হয় ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম দিয়ে। ডানহাতের আঙুলগুলি যদি ঘূর্ণনের দিকে বাঁকানো হয় তাহলে বুড়ো আঙুল ভেক্টরের দিক নির্দেশ করবে। (যখন আপনি কোন কাঁচের বোতলের ঢাকনা বা অন্য কোন কিছু খুলতে যান তখন আপনি নিয়মটির সহজ উদাহরণ দেখতে পান।) ১৪ নং চিত্রের উপরের অর্ধাংশে S ভেক্টর ফাইজইলের ঘূর্ণন বেগ নির্দেশ করে; মহাকর্ষের জন্য উদ্ভূত

টর্ক (মোচড়াম বল) কাঁটা কবজা বরাবর ভেক্টর T দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। বৈধিক বেগের নিয়ম ঘূর্ণন বেগের ক্ষেত্রে প্রসারিত করলে আমরা বেগ-পরিবর্তনের হার টর্কের সমানুপাতিক পাওয়ার আশা করি। এভাবে ঘূর্ণমান লাট্টিমের উপর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবের ফলে S দ্বারা প্রদর্শিত বেগ ভেক্টর পরিবর্তিত হয়ে S′ ভেক্টরের রূপ পাবে অর্থাৎ একটি উল্লম্ব অক্ষের চারধারে ঘূর্ণন হবে। ঠিক এরকমের আচরণই লক্ষ্য করা যায় ঘূর্ণমান লাট্টিমের ক্ষেত্রেও।

ফ্লাইহুইলের কৌণিক বেগ, টর্ক এবং লব্ধি বেগের মধ্যে সম্বন্ধ ১৪ নং চিত্রের হাত দ্বারা দেখানো হয়েছে। আপনার ডান হাতের মাঝের আঙুল যদি ঘূর্ণন ভেক্টর বুড়ো আঙুল টর্ক ভেক্টর নির্দেশ করে তাহলে আপনার তর্জনী সমগ্র ব্যবস্থাটির অভিঘূর্ণন দিক নির্দেশ করবে।

আমরা যে ঘটনার বর্ণনা এইমাত্র করলাম তাকে অয়ন (Precession) বলা হয় এবং যে সকল বস্তু ঘোরে, সেগুলি গ্রহ-নক্ষত্র হোক বা বাচ্চাদের খেলনা হোক বা পরমাণুর ইলেকট্রন হোক—সব ক্ষেত্রেই এটা বিদ্যমান থাকবে। পৃথিবীর গতির ক্ষেত্রেও অয়ন ঘটে সূর্য এবং চন্দ্রের আকর্ষণের জন্য; তার মধ্যে চন্দ্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করে, কারণ সূর্যের চেয়ে কম ভারী হওয়া সত্ত্বেও তা পৃথিবীর অনেক নিকটে। সূর্য ও চন্দ্রের মিলিত অয়ন পৃথিবীর অক্ষকে বছরে ৫০ কৌণিক সেকেণ্ড ঘুরায় এবং এভাবে প্রতি ২৫,৮০০ বছরে একটি পুরো বৃত্তে ঘুরায়। এই ব্যাপারটি বসন্ত ও শীতের আরম্ভের সময়ের ধীর পরিবর্তন ঘটায় এবং বিষয়টি যদিও গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপার্কাস খ্রীস্টপূর্ব ১২৫ বছর আগে আবিষ্কার করেন, তবু এর ব্যাখ্যা নিউটনের সর্বজনীন অভিকর্ষ মতবাদের পূর্বে পাওয়া যায়নি।

banglainternet.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

জোয়ার-ভাটা

পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে পৃথিবী গোলকের দৈনিক বিকৃতি যা সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মধ্যে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। নিউটন অনুধাবন করেছিলেন যে, নির্দিষ্ট সময়ান্তে সমুদ্রের পানির স্ফীতির কারণ পানির উপর সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণফল; এ ক্ষেত্রে চন্দ্রের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী, কারণ যদিও চন্দ্র সূর্যের চেয়ে কম ভারী তবু তা আমাদের অনেক বেশী নিকটে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে অভিকর্ষ বল দূরত্বের সাথে হ্রাস পায়; ভূ-গোলকের যে পার্শ্বে সূর্য বা চাঁদের অবস্থান সে পার্শ্বে তাদের আকর্ষণ অন্য পার্শ্বের চেয়ে বেশী হবে, ফলে ঐধারে পানি স্বাভাবিক উচ্চতা অপেক্ষা বেশী উপরে উঠবে।

লোকেরা যখন প্রথমবারের মতো জোয়ার-ভাটার এই ব্যাখ্যা শোনে তখন তাদের হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় কেন জোয়ারে দু'টি ঢেউ দেখা যায়—একটা দেখা যায় যে পাশে সূর্য বা চাঁদের অবস্থান এবং অন্যটা ঠিক এর উল্টো দিকে, যেখানে মহাকর্ষটানের উল্টো দিকে পানির বেগ বাড়ে বলে মনে হয়। এই বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য আমাদের সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের গতিসমূহ আরো একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। যদি চাঁদ একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির থাকত যেমন, মনে করা যাক, ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও বিরাট কোন গম্বুজের উপর আসীন থাকতো অথবা পৃথিবী তার কক্ষপথের কোথাও কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা নিশ্চল থাকতো তাহলে সত্যিই সমুদ্রের পানি একদিকে জমা হ'ত এবং বিপরীত পার্শ্বে পানির উচ্চতা হ্রাস পেত। কিন্তু চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে এবং পৃথিবী সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় থাকার কারণে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যায়।

প্রথমে আমরা সৌর জোয়ার-ভাটার আলোচনা করতে পারি। সূর্যের চার পাশে প্রদক্ষিণকালে পৃথিবী একটি অখণ্ড বস্তুরূপে ঘোরার জন্য পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের নিকটে অবস্থিত সে অংশের বেগ (১৬ক চিত্রের F) মাঝের অংশ (C)-এর বেগের চেয়ে কম এবং এই অংশের বেগ আবার

পশ্চাৎ-অংশের (R) বেগের চেয়ে কম। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছি যে সূর্যের মহাকর্ষ প্রভাবের জন্য বৃত্তপথে বস্তুর রৈখিক বেগ সূর্য হতে দূরত্বের অনুপাতে কমে। এজন্য বৃত্তপথে পরিভ্রমণের জন্য যে রৈখিক বেগের প্রয়োজন F বিন্দুর বেগ তদপেক্ষা কম; ফলে F বিন্দু সূর্যের দিকে সরে যেতে চাইবে যেমনটি ভাঙা তীরচিহ্ন দিয়ে ১৬ক চিত্রে দেখানো

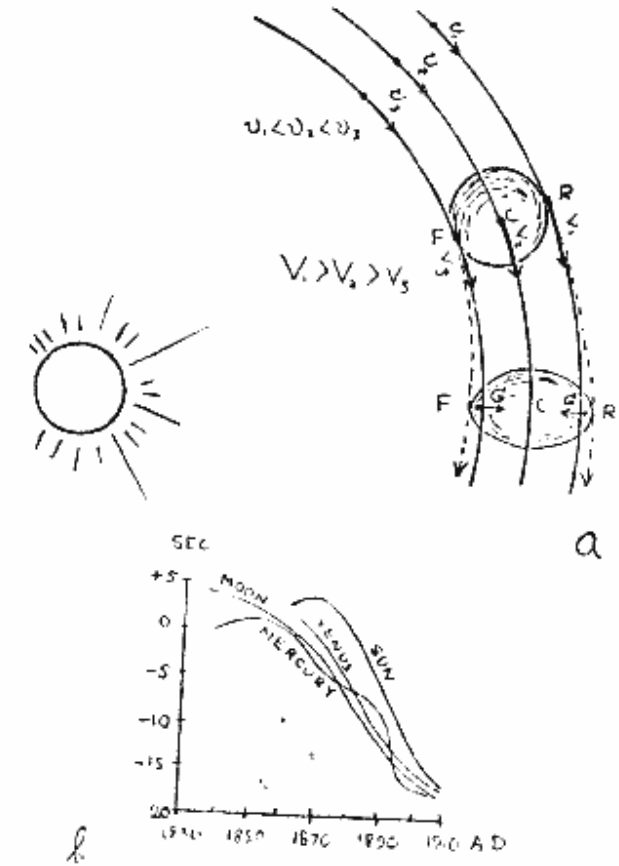

চিত্র ১৬: (a) জোয়ারবেগের উৎস; (b) নভোমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিতে আপাতবিষম।

হয়েছে। অনুরূপভাবে R বিন্দুর রৈখিক বেগ অবর্তনের জন্য যে বেগের দরকার তার চেয়ে বেশী বলে R বিন্দু সূর্য হতে দূরে যেতে থাকবে

banglainternet.com

(R-ভাঙা তীরচিহ্ন)। সুতরাং পৃথিবীর উপাদান পদার্থসমূহের মধ্যে কোন আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে উপবৃত্তাকার পথের উপর ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্যমান মহাকর্ষ বল G-এর ফলে এমনটা কখনো হয় না এবং বিভিন্ন অংশ পরস্পরকে ধরে রাখে। আর এই আকর্ষণের ফলে পৃথিবী গোলক কক্ষপথ ব্যাসার্ধ বরাবর লম্বা হয়ে গিয়ে দু' পাশে দু'টি স্ফীতি সৃষ্টি করে।

চন্দ্রের আকর্ষণজনিত জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে ঠিক একই রকমের যুক্তি প্রদর্শন করা যাবে তবে শুধু মনে রাখা দরকার যে পৃথিবী ও চাঁদ উভয়েই একটা সাধারণ ভার কেন্দ্রের চারধারে ঘোরে। যেহেতু ভরের দিক থেকে চাঁদ পৃথিবীর প্রায় আশিভাগের একভাগ সেজন্য তাদের সাধারণ ভার কেন্দ্র থেকে তাদের মধ্যেকার দূরত্বের $\frac{১}{৮০}$ ভাগ দূরে। এই দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬০ গুণের সমান বলে আমরা বলতে পারি যে, চন্দ্র-সূর্য ব্যবস্থার ভার কেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্র হতে ৩০/৮০ = $\frac{৩}{৪}$ গুণ পৃথিবী ব্যাসার্ধের পরিমাণ দূরে। পরিমাণগত রাশির পরিবর্তন সত্ত্বেও পূর্বের ভৌত যুক্তি এ ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকবে। পৃথিবীর সমুদ্রের পানি দু'দিকে স্ফীত হয়ে উঠে; স্ফীতির দিক তাদের সাধারণ ভারকেন্দ্রের দিকে (যে দিকে চাঁদেরও অবস্থান), অন্য স্ফীতির দিকে ঠিক-এর বিপরীত দিকে।

তখন সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থান করে অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় সূর্য ও চন্দ্রের জোয়ার-ভাটার ক্রিয়া একত্র হয়ে প্রবলতর হয়। যদিও প্রথম ও শেষ চতুর্থাংশে চন্দ্রের প্রবল জোয়ার সূর্যের ভাটার সাথে একত্র হয়ে মোট ফলকে কমিয়ে ফেলে।

পৃথিবী মিরেট দূরবস্থ নয় বলে সূর্য ও চন্দ্রের জোয়ার-ভাটার সময় ঘূর্ণিরত বল ভূ-গোলককে কিছুটা বিকৃত করে, যদিও এই বিকৃতির পরিমাণ ভূ-বেষ্টনকারী তরল পদার্থের তুলনায় অত্যন্ত কম। মার্কিন পদার্থবিদ এ. এ. মাইকেলসন* তাঁর পরীক্ষায় দেখেছিলেন যে, প্রতি ১২ ঘন্টায় পৃথিবীতল যেখানে এক ফুটের মতো বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের বিকৃতির পরিমাণ সেখানে প্রায় চার থেকে পাঁচ ফুটের মতো। ভূ-ত্বকের বিকৃতি

* Michelson and the Speed of Light, Bernard Jaffe, Science Study Series. 1960.

বেশ আস্তে ও নিয়মিতভাবে ঘটে বলে আমরা টের পাই না যে, আমরা কম্পনশীল ভূমির উপর বাস করছি। কিন্তু তীরভূমিতে সমুদ্রের জোয়ারের পানি উঠতে দেখলে আমাদের মনে পড়া উচিত যে আমরা যা দেখছি তা হচ্ছে মাটি ও পানির তলের উল্লম্ব গতির বিয়োগফল।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার পানি ভূ-পৃষ্ঠের চারধারে আসা-যাওয়ার কালে সমুদ্রতলের সাথে ঘষা খায় (বিশেষ করে অগভীর তল যেমন বেরিং সাগর) এবং মহাদেশের উপকূলে ঘর্ষণের জন্যও শক্তি হারায়। স্যার হ্যারল্ড জেফ্রিস এবং স্যার জিওফ্রে টেইলর নামে দু'জন বৃটিশ বিজ্ঞানী এই শক্তি অপচয়ের পরিমাণ ২ বিলিয়ন অশ্বশক্তি বলে স্থির করেন। এই পরিমাণ শক্তি ব্যয়ের কারণে পৃথিবীর অক্ষের আবর্তনবেগ কমে যায়, যেমন ব্রেক কষা হলে মোটরগাড়ির ক্ষেত্রে ঘটে। পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের কারণে উদ্ভূত শক্তির সাথে এই শক্তির তুলনা করলে দেখা যায় যে পৃথিবী প্রতি আবর্তনে 0·০০০০০০২ সেকেণ্ড ধীরে যায়; প্রতিটি দিনের দৈর্ঘ্য পূর্ববর্তী দিন অপেক্ষা এক সেকেণ্ডের ২০ কোটি ভাগের এক ভাগ পরিমাণ অধিক। এই পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে আজ ও আগামীকাল বা এক নববর্ষ হতে অন্য নববর্ষের মধ্যেকার পার্থক্য মাপার কোন উপায় নেই। কিন্তু বছরগুলি গত হওয়ার সাথে সাথে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এক শতাব্দীতে দিনের সংখ্যা ৩৬,৫২৫; কাজেই এখনকার দিনগুলির চেয়ে একশো বছর আগের দিনগুলি 0·০০০৭ সেকেণ্ড পরিমাণ ছোট ছিল। এখন ও তখনকার দিনগুলির গড় হিসাব মিলে বলা যায় তখনকার দিন এখনকার দিনের চেয়ে 0·০০০৩৫ সেকেণ্ড কম ছিল। কিন্তু যেহেতু ৩৬,৫২৫ দিন পার হয়ে গেছে, অতএব মোট পার্থক্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৬,৫২৫ × 0·০০০৩৫ = ১৪ সেকেণ্ড।

পরিমাণগত বিচারে প্রতি শতাব্দীতে ১৪ সেকেণ্ড খুবই নগণ্য, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ ও হিসাবের আশুতার মধ্যে তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর অক্ষের চারধারের আবর্তনের এই ধীরতা থেকে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে এক দীর্ঘস্থায়ী গরমিলের সমাধান পাওয়া গিয়েছে। স্থির নক্ষত্রের অবস্থানের সাথে সূর্য, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র গ্রহের অবস্থানকে তুলনা করে জ্যোতির্বিদরা লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রহগুলি যেন নতো বলবিদ্যার সাহায্যে হিসাব করা তাদের শতাব্দীপূর্ব অবস্থানের

banglainternet.com

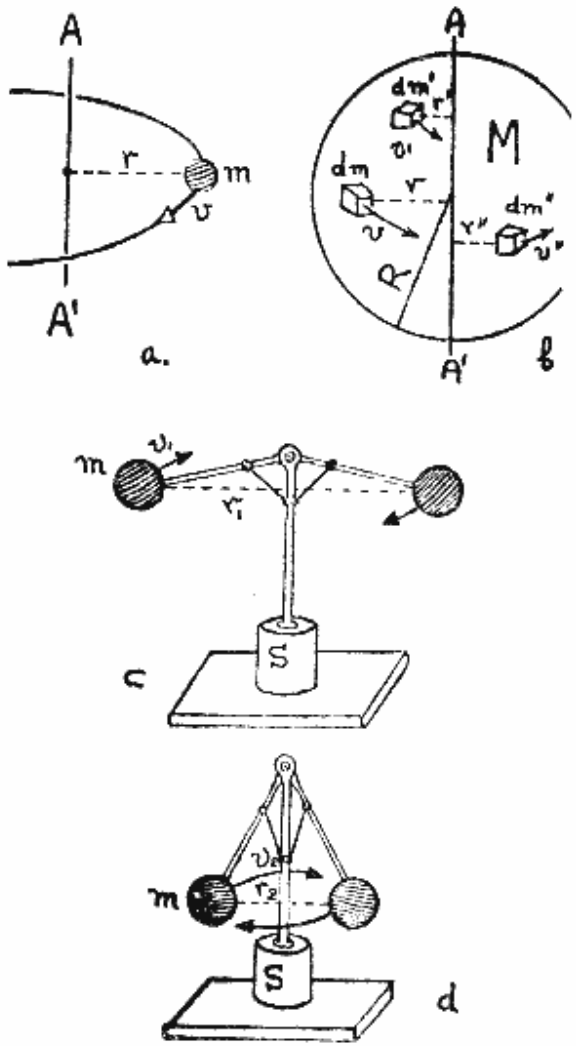

চিত্র ১৭. ঘূর্ণনরত বা আবর্তনরত বস্তুর কৌণিক ভরবেগ হচ্ছে (a) বস্তুটির ভর (m) ও বেগের (v) গুণফল, এবং ঘূর্ণন অক্ষ (r) থেকে এর দূরত্ব।

তুলনায় নিয়মিতভাবে সময়ের আগে চলেছে (চিত্র-১৬খ) টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠান যদি আপনার মতে যথাসময়ের ১৫ মিনিট পূর্বে শুরু হয়, কোন দোকান যদি সেটি বন্ধ হওয়ার সময়ের আগে এসেও

আপনি বন্ধ দেখতে পান এবং আপনি এমন একটি ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হলেন যেটি ধরতে আপনি নিশ্চিতভাবে যথাসময়ে এসেছেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে টেলিভিশন, দোকান বা রেল ব্যবস্থাকে দোষারোপ না করে আপনার ঘড়িটিকেই দায়ী করা দরকার। সম্ভবত ঘড়িটি ১৫ মিনিট পেছনে চলছে। একইভাবে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন ঘটনার ১৫ সেকেন্ডের গরমিল পৃথিবীর আস্তে চলার উপর আরোপিত হওয়া উচিত, নভোকাশের বস্তুদের বেগ দ্রুততর হওয়ার উপর নয়। পৃথিবীর আবর্তন-বেগ ধীর হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানার আগে জ্যোতির্বিদরা পৃথিবীকে একটি নির্ভুল ঘড়িরূপে গণ্য করতেন। এখন তাঁরা এ সম্পর্কে ভাল জানেন এবং জোয়ার-ভাটার পানির ঘর্ষণের জন্য সংশোধনীকে হিসাবের মধ্যে ধরেন।

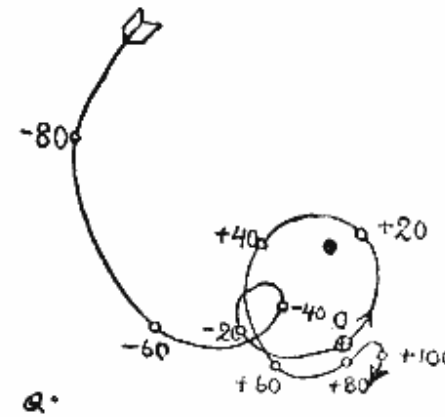

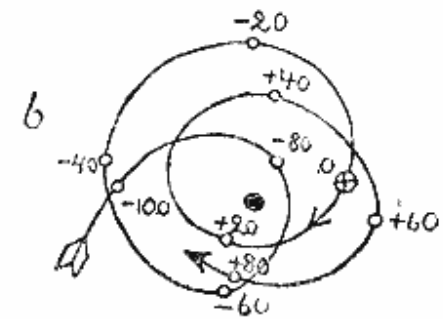

চিত্র ১৮. গ্রহদের আকর্ষণজনিত কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণনপথের উৎকেন্দ্র (a) এবং নতির পরিবর্তনসমূহ।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশ জ্যোতির্বিদ জর্জ ডারউইন, Origin of Species বই এর বিখ্যাত লেখকের পুত্র, জোয়ার-ভাটার ঘর্ষণজনিত কারণে অপচয়িত শক্তির প্রভাব কি করে অবশেষে পৃথিবী-চন্দ্র ব্যবস্থার উপর পড়ে সে সম্পর্কে গবেষণা করেন।

ডারউইনের যুক্তি বুঝতে হলে আমাদের বলবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি কৌণিক ভরবেগের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। m ভরের একটি বস্তু নেওয়া যাক যা কোন স্থির অক্ষ A A′ হতে r দূরত্বে (চিত্র ১৭ক) অবস্থান করে v বেগে ঘুরছে। বস্তুটি সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণনরত পৃথিবী, পৃথিবীর চারপাশে ঘূর্ণনরত চন্দ্র বা বালকের হাতে ধরা সুতার মাথায়

বাঁধা একটা ঘূর্ণনশীল প্রস্তরখণ্ড হতে পারে। কৌণিক ভরবেগ I কে বস্তুর ভর, বেগ এবং অক্ষ হতে দূরত্ব r-এর গুণ ফল রূপে চিহ্নিত করা যায়:

$$I = mvr$$

বিষয়টি আরো একটু জটিল হয় ঐ সকল বস্তুর ক্ষেত্রে যেগুলি তার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়া অক্ষের চারপাশে আবর্তন করে, হোক না সেটা ফ্লাইহুইল বা পৃথিবী (চিত্র-১৭খ); পূর্বের ক্ষেত্রে বস্তুর প্রতিটি অংশ প্রায় একই বেগে ঘোরে (যদি অক্ষপথের তুলনায় বস্তুর আকার ছোট হয়)। কিন্তু অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে ঘোরে: অক্ষ থেকে যেটি যত বেশী দূরে সেটি তত বেশী দ্রুত ঘোরে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর ক্ষেত্রে নিরক্ষীয় অঞ্চলের কোন বিন্দুতে মেরুবৃত্তে অবস্থিত কোন বিন্দুর চেয়ে অনেক দ্রুত ঘোরে আর মেরু বিন্দুগুলি একদম স্থির। তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি করে কৌণিক ভরবেগ নির্দিষ্ট হবে? এ ক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে সমাকলন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

আমরা বস্তুর গোটা ভর m কে ক্ষুদ্র খণ্ডভর dm, dm′, dm′′ ইত্যাদিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করব। এ ধরনের তিনটি খণ্ডভর চিত্রে দেখানো হয়েছে; অক্ষরেখা হতে এদের দূরত্ব যথাক্রমে r, r′, r′′ এবং বেগ v, v′, v′′। অবশ্য এই বেগ তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক। গোটা বস্তুর কৌণিক ভরবেগ I নির্ণয়ের জন্য আমাদের খণ্ডভরের কৌণিক ভরবেগের সমাকলন করতে হবে। এ জন্য আমরা লিখি:

$$I = \int dm_i v_i r_i$$

এখানে সমাকলন পুরো বস্তুটির জন্য করতে হবে। সমাকলনের সাহায্যে যে কেউ দেখাতে পারে:

$$I = \frac{2}{5} v_r r$$

এখানে r ঘূর্ণায়মান বস্তুর ব্যাসার্ধ এবং V_r বস্তুর নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত বিন্দুর বেগ।

নিউটন প্রদত্ত সমাস্তন বলবিদ্যার একটি মূল সূত্র হচ্ছে ভরবেগের নিত্যতার সূত্র; এই সূত্রমতে, যদি একাধিক বস্তু তাদের অক্ষের চারপাশে এবং একে অন্যের চারপাশে ঘুরতে থাকে তাহলে ব্যবস্থাটির মোট কৌণিক ভরবেগ সকল সময়ে সমান থাকবে।

১৭ নং চিত্রের নিচের অংশে প্রদত্ত যন্ত্রের সাহায্যে শ্রেণীকক্ষে মূলনীতি প্রদর্শন করা যায়। এই ব্যবস্থায় দু'টি দণ্ডের প্রান্তে ওজন আটকানো থাকে; দণ্ড দু'টি আবার একটি সকেট 'S'-এর অভ্যন্তরে ঘূর্ণায়মান খাড়া দণ্ডের মাথায় লাগানো থাকে। একটি বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে (চিত্রে প্রদর্শিত হয়নি) ওজন দু'টিকে ইচ্ছামতো উপরে উঠানো (চিত্র ১৭ গ) বা নিচে নামানো (চিত্র ১৭ ঘ) যায়।

মনে করুন, ওজন দু'টি উপরে উঠানো (গ) অবস্থায় আমরা অক্ষের চারধারে ব্যবস্থাটিকে ঘুরিয়ে এতে কিছুটা কৌণিক ভরবেগের সঞ্চার করি। পূর্বের সংজ্ঞানুযায়ী, তাহলে প্রতিটি ওজনের কৌণিক ভরবেগ হবে m v, r,; v, ও r-এর অর্থ ১৭ গ চিত্রে দেখানো হয়েছে। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় এবার ওজন দু'টিকে নিচে নামিয়ে ১৭ ঘ চিত্রের মতো অবস্থায় আনা যাক, যেন অক্ষ হতে তাদের নতুন দূরত্ব r_2 পূর্বের দূরত্ব r-এর অর্ধেক হয়। যেহেতু mvr-এর কোন পরিবর্তন হবে না, অতএব r অর্ধেক হওয়ার ফলে v অবশ্যই দ্বিগুণ পরিমাণ বর্ধিত হওয়া দরকার। কাজেই কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা সূত্রের জন্য বেগের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার প্রয়োজন; আর ঠিক দেখা যায় যে শেষের ক্ষেত্রে $v_2 = 2v_1$ হয়।

এই নীতির ব্যবহার করে সার্কাসের খাজিকর ও বরফে স্কেটিংকারী প্রভৃতি লোক চমক-লাগানো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। দু'বাহু হাত ভূমির সমান্তরাল করে দড়ি বা বরফের উপর অপেক্ষাকৃত আস্তে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে হাত নামিয়ে শরীরের সাথে লাগিয়ে তারা চরকির মতো বন বন করে ঘুরতে আরম্ভ করে।

অতএব পৃথিবী ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্র প্রয়োগ করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, জোয়ার-ভাটাজনিত ঘর্ষণের ফলে অক্ষের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কৌণিক ভরবেগ যে পরিমাণ কমে যাবে, কক্ষপথে চন্দ্রের পৃথিবী আবর্তনের জন্য সৃষ্ট কৌণিক ভরবেগ ঠিক সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। কৌণিক ভরবেগের এই বৃদ্ধির কারণে চাঁদের গতির কি পরিবর্তন ঘটবে? চন্দ্রের আর্তনের জন্য তার কৌণিক ভরবেগের পরিমাণ,

$$I = mvr$$

banglainternet.com

এখানে m = চন্দ্রের ভর, v = চন্দ্রের বেগ এবং r হচ্ছে তার কক্ষ-পথের ব্যাসার্ধ। অন্যদিকে, নিউটনের অভিকর্ষ-সূত্র ও কেন্দ্রাতিগ বলের সূত্রের একত্রীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}, \text{ এখানে } M = \text{পৃথিবীর ভর।}$$

$$\therefore \quad \frac{GM}{r} = v^2$$

এখান থেকে এবং পূর্বের 1-এর সূত্র থেকে পাওয়া যায়,

$$r = \frac{l^2}{GMm^2} \text{ এবং } v = \frac{GMm}{l}$$

যদি পাঠকেরা উপরের সূত্রাবলী প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ না হ'ন তাহলে আপনারা লেখকের কথাকেই সত্য বলে ধরে নিন। উপরের সূত্র দু'টি হ'তে লক্ষ্য করা যায় যে, পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনকালে চন্দ্রের কৌণিক ভরবেগের বৃদ্ধি পৃথিবী হ'তে তার দূরত্বের বৃদ্ধি ঘটায় এবং রৈখিক বেগ হ্রাস করে।

পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের পর্যবেক্ষিত হ্রাস থেকে যে কেউ পৃথিবী হ'তে চন্দ্রের দূরত্ব বৃদ্ধির পরিমাণ বের করতে পারে এবং দেখা যায় এই পরিমাণ প্রতি ঘূর্ণনের জন্য $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। সুতরাং প্রতি অমাবস্যার পর নতুন চাঁদ আপনার নিকট থেকে ঐ পরিমাণ দূরত্বের পরিবর্তন অত্যন্ত নগণ্য; কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্র এভাবে কোটি কোটি বছর ধরে অবস্থান করছে এবং এতদিনের ফল একত্র করে জর্জ ডারউইন দেখতে পেয়েছিলেন যে 4 থেকে 5 বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী ও চন্দ্র খুব কাছাকাছি ছিল এবং তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে একদা হয়তো তারা একটা অখণ্ড বস্তু (পৃথিবীন্দ্র বা চন্দ্রথিবী) ছিল। দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার মূলে হয়তো আছে সৌর মহাকর্ষের জোয়ার-ভাটার বল বা অন্য কোন দুর্ঘটনা যা বহুপূর্বে সৌরজগতে ঘটেছিল এবং এখন মহাকালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। যে সব বিজ্ঞানী চন্দ্রের জন্মসন্ধানে উৎসাহী তাঁদের মধ্যে ডারউইনের এই মতবাদ ভীষণরকম একটা বিতণ্ডার সৃষ্টি করেছে। কেউ

কেউ এটা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন (হয়তো শুধুমাত্র এর চমৎকারিত্বের খাতিরে) আর অন্যেরা এর ঘোরতর বিরোধী।

মডো-বলবিদ্যা থেকে হিসাবকৃত তথ্যাবলী দ্বারা চাঁদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য রাখা যেতে পারে। পৃথিবী ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাওয়ার ফলে চাঁদ অবশেষে এত দূরে চলে যাবে যে এর আলো যেমন এখন লণ্ঠনের পরিবর্তে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার করা যায় তেমনটি আর থাকবে না। ইতিমধ্যে সৌর জোয়ারের কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ হ্রাস পাওয়ার (অবশ্য সমুদ্রগুলি যদি শুকিয়ে না যায়) ফলে এমন সময় আসবে যখন একটি দিনের দৈর্ঘ্য বর্তমানের মাসের চেয়েও বেশী হবে। তখন চন্দ্রের জোয়ারের ঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রয়াস পাবে এবং কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্রের কারণে চাঁদ ধীরে ধীরে পৃথিবীর কাছে আসতে থাকবে যতদিন না জন্মের সময় চাঁদ পৃথিবীর যত কাছে ছিল সেই দূরত্বে আসে। এ অবস্থায় পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল সম্ভবত চাঁদকে ভেঙে কোটি কোটি টুকরায় পরিণত করবে এবং শনি গ্রহের বলয়ের মতো একটা বলয় তৈরি হবে। কিন্তু মডো-বলবিদ্যা থেকে যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে এরূপ অবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারটি এতোই দূরে যে তার আগেই সূর্যের পারমাণবিক জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে যাবে এবং এর ফলে সমগ্র গ্রহজগত অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

banglainternet.com

সপ্তম অধ্যায়

নভো-বলবিদ্যার জয়যাত্রা

নিউটন প্রদত্ত মহাকর্ষ সূত্র ও তাঁর আবিষ্কৃত কলন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মহীরূহের যে বীজ রোপিত হয় শতাব্দীকালের মধ্যে তা একটি সুন্দর অথচ গহীন বনে পরিণত হয়। যোসেফ লুই ল্যাগ্রেঞ্জ (১৭৩৬-১৮১৩) এবং পিয়ের সাইমন ল্যাপলাস (১৭৪৯-১৮১৭)-এর মতো কয়েকজন ফারসী গণিতবিদের হাতে নভো-বলবিদ্যার যে উৎকর্ষ সাধিত হয় তা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। গ্রহগুলি শুধুমাত্র সৌর-আকর্ষণের অধীনে থাকলে তাদের আবর্তনের জন্য কেপলারের সূত্রের মতো সহজ সূত্র সঠিকভাবে প্রযোজ্য হ'ত; কিন্তু গ্রহদের গতির মতবাদ ক্রমান্বয়ে অত্যন্ত জটিল হ'তে থাকে যখন তাদের নিজেদের পারস্পরিক আকর্ষণ বা দ্বন্দ্বকে হিসাবের ভিতর আনা হয়। অবশ্য সূর্যের তুলনায় গ্রহদের ভর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এ জন্যই আন্তঃগ্রহ আকর্ষণের জন্য তাদের গতির পরিবর্তন অত্যন্ত নগণ্য; কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিখুঁত মাপের তুলনীয় ফল অর্জন করতে হলে একে অগ্রাহ্য করা যাবে না। এ ধরনের হিসাবের জন্য প্রয়োজন প্রচুর সময় ও শ্রম (বর্তমানে ইলেকট্রনিক কমপিউটার ব্যবহার করে পরিশ্রম লাঘব করা হয়েছে)। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান বিজ্ঞানী ই. ডবলিউ. ব্রাউন তাঁর চার খণ্ডে প্রকাশিত বই 'Tables of Moon'-এর তিন খণ্ডের উপাত্ত (data) প্রস্তুতের জন্য প্রায় দুই দশক পরিশ্রম করে কয়েক হাজার অঙ্কের সমাধান করেন।

এ ধরনের শ্রম অনেক সময় পুরস্কৃত হয়। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একজন তরুণ ফরাসী জ্যোতির্বিদ জে. জে. লেভেরিয়ার (J.J. Leverrier) ১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্শেল কর্তৃক ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত ইউরেনাস গ্রহের বর্তমান অবস্থানের সাথে তাঁর আবিষ্কারের তেষট্টি বছর আগের অবস্থানের তুলনা করার সময় কিছু গরমিল দেখতে পান। পর্যবেক্ষণ ও হিসাবের মধ্যেকার গরমিলটা ২০ কৌণিক সেকেণ্ডের (দশমাইল দূরের

একজন মানুষের দ্বারা তৈরি কোণের সমপরিমাণ) মতো এই পরিমাণ পর্যবেক্ষণ বা হিসাবের সাম্ভাব্য ত্রুটির কারণে হতে পারে না। লেভেরিয়ার সন্দেহ করলেন যে, এই গরমিল ইউরেনাস গ্রহের বাইরে দিয়ে আবর্তনকারী কোন অজানা গ্রহের প্রভাবের কারণেও হতে পারে। ইউরেনাস গ্রহের গতির বিচ্যুতির পর্যবেক্ষণ হ'তে তিনি এই অজানা গ্রহের সম্ভাব্য ভর এবং তার গতির প্রকৃতি হিসাব করতে বসে গেলেন। ১৮৪৬ সালের শরতের দিকে লেভেরিয়ার বার্লিন মানমন্দিরের জে. জি. গ্যাল (J.G. Galle)-কে তিনি লেখেন- "আপনি আপনার টেলিস্কোপকে ৩২৬° দ্রাঘিমার একোয়ারিস (Aquarius) নক্ষত্র জগতে একলিপটিক (ecliptic) বিন্দু বরাবর স্থাপন করুন; সেখানে ১° ডিগ্রীর মধ্যে দেখতে পাবেন একটা নতুন গ্রহ যেটি নবম মানের একটা তারার মতো উজ্জ্বল দেখায় এবং যার চোখে পড়ার মতো চাকতি আছে।"

গ্যাল নির্দেশ পালন করেন; নেপচুন নামের নতুন গ্রহটি ১৮৪৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয়। জে.সি.অ্যাডামস(J.C.Adams) নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানীও লেভেরিয়ের সাথে নেপচুন গ্রহের গাণিতিক আবিষ্কারের সম্মানের অংশীদার হন। কিন্তু যাঁর কাছে অ্যাডামস তাঁর হিসাবের ফলাফল জানিয়েছিলেন, কেমব্রিজ বিদ্যালয়ের সেই টি. চেলিস (T. Challis), তাঁর অনুসন্ধান কাজে মন্থরতার জন্য তিনি পিছিয়ে পড়েন।

অপেক্ষাকৃত কম নাটকীয়ভাবে এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে। হার্ভার্ড মানমন্দিরের আমেরিকান বিজ্ঞানী ডব্লিউ.এইচ. পিকারিং (W.H. Picks ring) এবং আরিজোনার লাওয়েল মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পারসিভাল পাওয়েল (Percival Powell) দ্বিতীয় দশকের শেষাংশে ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের গতির বিচ্যুতির জন্য নেপচুন হতে দূরবর্তী আরেকটি গ্রহের উপস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু প্লুটো নামের এই নতুন গ্রহ যা হয়তো বা নেপচুন গ্রহেরই একটি পালিয়ে যাওয়া উপগ্রহ, এর দশ বছর পর ১৯৩০ সালে লাওয়েল মানমন্দিরের একজন গবেষক সি. ডবলিউ. টমবাগ (C. W. Tombaugh) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে, গাণিতিক ভবিষ্যদ্বাণী না আবিষ্কারকের কঠিন শৃঙ্খলাপূর্ণ অনুসন্ধানের ফল, তা নির্ণয় করা মুশকিল।

banglainternet.com

নভো-বলবিদ্যার হিসাবের ফলের নির্ভুলতার পরিচয় অন্য একটি কৌতুককর উদাহরণে পাওয়া যায়; এটা সূর্য চন্দ্রগ্রহণের তারিখ-নির্ধারণ করে পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্র নির্ধারণ সম্পর্কিত। ১৮৮৭ সালে অস্ট্রীয় জ্যোতির্বিদ থিওডোর ফন অপলৎসার (Theodore Von Onpolzer) ১২০৭ খ্রীস্টপূর্ব হতে শুরু করে ২১৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সকল অতীত ও আগামী সূর্য-ও চন্দ্র-গ্রহণের হিসাব করা সময়পঞ্জী প্রকাশ করেন; এতে মোট ৮০০০ সৌর ও ৫২০০ চন্দ্র গ্রহণের তালিকা ছিল। এই তালিকা থেকে দেখা যায়, আমাদের দিনপঞ্জী চার বছর পিছিয়ে আছে। বাস্তবিক পক্ষে, ঐতিহাসিক দলিল থেকে দেখা যায় জুডীয় রাজা হেরোড যিনি যীশু খ্রীস্টকে হত্যার নিমিত্ত তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে বেথেলহামের সকল শিশুকে হত্যার নির্দেশ দেন, তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশে 'চন্দ্রগ্রহণ' ঘটে। অপলৎসারের তালিকা অনুসারে একমাত্র যে চন্দ্রগ্রহণটি এই ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি খ্রীস্টপূর্ব তিন শতকের ১৩ই মার্চ (শুক্রবার ?) সংঘটিত হয়; এ থেকে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে আমাদের দিনপঞ্জী মোতাবেক আমরা যীশু খ্রীস্টের যে জন্মতারিখ পাই তিনি তার চার বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইতিহাসের পাতায় উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণের উদাহরণের মধ্যে আছে খ্রীস্টপূর্ব ৬৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলের গ্রহণ যার সাহায্যে গ্রীক ঘটনাপঞ্জীর প্রাচীনতম ঘটনার তারিখ নিশ্চয়তার সাথে নির্ণয় করা হয় এবং আরও আছে খ্রীস্টপূর্ব ৯১১ সালের গ্রহণ যার সাহায্যে প্রাচীন অ্যাসিরীয় ঘটনাবলীর সময় নির্ধারিত হয়।

আমরা, যারা পৃথিবীর অধিবাসী, তাদের কাছে অন্যান্য গ্রহের কারণে পৃথিবীর কক্ষপথের বিচ্যুতির হিসাব বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। যে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ভ্রমণ করে তা পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ হলে যেরূপ অপরিবর্তনীয় হ'ত তা থাকে না; সৌরজগতের অন্যান্য সদস্যের মহাকর্ষ টানে এই পথ ধীরে ধীরে ও ক্রমাগত এদিক ওদিক যায় এবং স্পন্দিত হয়। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখেছি যে, সৌর ও চান্দ্র অগ্রগমনের কারণে আমাদের ভূ-গোলকের ঘূর্ণায়মান অক্ষ মহাকাশে একটা সদৃশ তল রচনা করে যার পর্যায়কাল ২৫০৮০ বছর। এছাড়া সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষ টানে পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্র এবং মহাকাশে তার

হেলানকোণ অতি ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। নভো-বলবিদ্যার সাহায্যে মোট পরিবর্তনের পরিমাণ অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যায়। ১৮ নং চিত্রে এই পরিবর্তন বিগত ১,০০,০০০ বছর থেকে শুরু করে আগামী ১,০০,০০০ বছরের জন্য দেখানো হয়েছে। চিত্রের উপরের অংশে

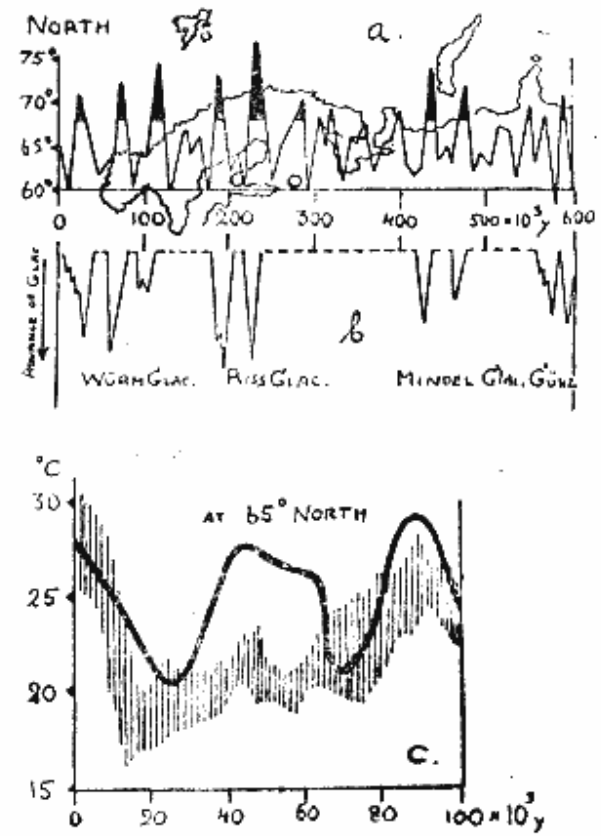

চিত্র ১৯. হিমবাহের অতীত অগ্রগমন (b) এবং সমুদ্রের প্রাচীন তাপমাত্রার (c) সাথে মিলান কোভিচের জলবায়ুগত রেখার (a) তুলনা।

পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রের পরিবর্তন এবং তার বৃহৎ অক্ষের ঘূর্ণন বৃত্তাকার এবং এজন্যই এর ফোকাস (focus) জ্যামিতিক কেন্দ্রের অতি নিকটে অবস্থিত (বড় কালো বিন্দু)। বিন্দু দু'টি পরস্পর হ'তে দূরে অবস্থিত

banglainternet.com

হলে কক্ষপথের উৎকেন্দ্র বড়; বিন্দুদ্বয় কাছাকাছি হলে উৎকেন্দ্র ছোট আর যখন বিন্দু দু'টি মিলিত হয় তখন উপবৃত্ত একটি বৃত্তে পরিণত হয়। চিত্রটি যে স্কেলে আঁকা হয়েছে তাতে কক্ষপথের ব্যাসের মান প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি।

১৯ নং চিত্রে অপরিবর্তনীয় তলের সাপেক্ষে অক্ষের হেলান কোণের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। আমরা দেখতে পাই, এখন থেকে আশি হাজার বছর আগে পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্র মোটামুটিভাবে বড় ছিল, কিন্তু এখন এর মান অনেক ছোট ('×' চিহ্নিত বৃত্ত) এবং আগামী বিশ হাজার বছর পরে আরও ছোট হয়ে যাবে।

পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন পৃথিবীর জলবায়ুকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। উৎকেন্দ্রের বৃদ্ধি সূর্য হতে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম দূরত্বের অনুপাতের পরিবর্তন করে, ফলে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের তাপমাত্রার পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। কক্ষতলের সাথে পৃথিবীর অক্ষের কোণের বৃদ্ধিও গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের তাপমাত্রার পরিবর্তন করে। কারণ আমরা জানি ঘূর্ণন-অক্ষ কক্ষতলের সাথে সমকোণে অবস্থান করলে সারা বছর ধরে একই তাপমাত্রা বিরাজ করত। তাপমাত্রার এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সার্বিয়ান জ্যোতির্বিদ এম. মিলানকোভিচ (M. Milankovich) ১৯৩৮ সালে হিমবাহ যুগের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন; এই যুগে বরফস্তূপ উত্তর দিক হতে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে মধ্য অক্ষাংশের নিম্ন-ভূমির দিকে সরে গিয়েছিল। মিলানকোভিচের হিসাব করার পদ্ধতি ১৮ নং চিত্রে প্রদর্শিত লেভেরিয়ের পদ্ধতির অনুরূপ ছিল, কিন্তু তিনি ছয় লক্ষ বছর পিছনের সময় পর্যন্ত হিসাব করেছিলেন। বর্তমানে ৬৫° উত্তর অক্ষাংশে একক তলে যে-পরিমাণ সৌরতাপ গ্রীষ্মকালে পতিত হয় সে তাপকে আদর্শ তাপ ধরে নিয়ে অতীতের বিভিন্ন সময়ে সেই একই পরিমাণ তাপ পেতে কত উত্তর বা দক্ষিণে যেতে হয়—তিনি তা নির্ণয় করেন। এই হিসাবের ফল ১৯ক চিত্রে দেখানো হয়েছে; এখানে ইউরেশিয়ার উত্তর উপকূলের মান-চিত্রের উপর হিসাবকৃত ফলাফল দেখানো হয়েছে। এতে বৃহৎ শীর্ষ সৌরতাপের হ্রাস এবং ক্ষুদ্র শীর্ষ সৌরতাপমাত্রার বৃদ্ধি নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, একলক্ষ বছরের কিছু বেশী আগে ৬৫° উত্তর অক্ষাংশে (মধ্য নরওয়ে) যে পরিমাণ তাপ পতিত হত তা বর্তমানে স্পিটজবার্জেন (Spitzbergen) অক্ষাংশে আগত তাপের সাথে তুলনীয়। অন্যদিকে মাত্র

দশ হাজার বছর আগে মধ্য নরওয়ের আবহাওয়া ছিল অসলো ও স্টকহোমের বর্তমান আবহাওয়ার মতোই। ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্ত অনুসারে হিমবাহের দক্ষিণ-মুখী অগ্রগমনের পরিমাণ ১৯খ চিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, এই দুই চিত্রের মধ্যে মিল অত্যন্ত স্পষ্ট।

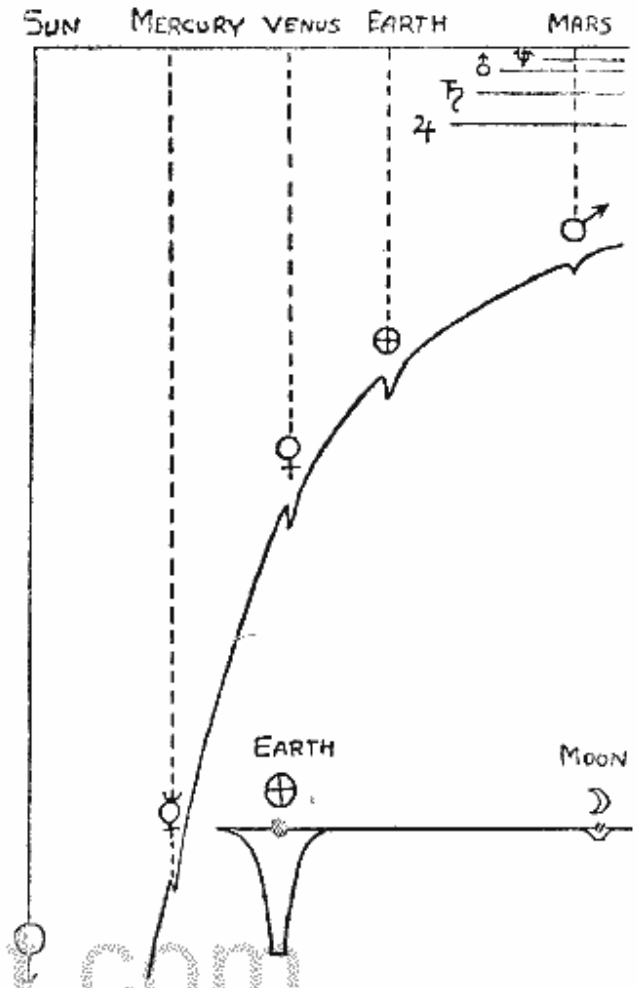

চিত্র ২০. সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে মহাকর্ষজনিত বিভব ঢাল। নিচে ডানদিকে পৃথিবী ও চন্দ্রের মহাকর্ষ বিভব দেখানো হয়েছে।

banglainternet.com

১৯গ-এর লেখচিত্রে অতীত ভূ-তাত্ত্বিক যুগে সমুদ্রের পানির বিগত মাত্র এক লক্ষ বছরের তাপমাত্রা প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হ্যানস্ সেস (Hans Suess) ১৯৫৬ সালে তা প্রকাশ করেন এবং এই তাপমাত্রা নির্ধারণে যে চাতুর্যপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী হ্যারল্ড উরি (Harold Urey) কর্তৃক ১৯৫১ সালে সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত হয়। এই পদ্ধতি যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে এই যে সমুদ্রতলের পাললিক শিলাস্তরে বর্তমান ক্যাল-সিয়াম কার্বোনেটের ($CaCO_3$) মধ্যের অক্সিজেন পরমাণুর ভারী ও হাল্কা আইসোটোপের ($O^{১৮}, O^{১৬}$) অনুপাত শিলা গঠিত হওয়ার সময়ের সমুদ্রের পানি উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং সমুদ্রতলের বিভিন্ন গভীরতায় $O^{১৮}/O^{১৬}$ অনুপাত নির্ণয় করে যে কেউ লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে সেখানকার পানির উষ্ণতা এত নিশ্চয়তার সাথে নির্ণয় করতে পারে যেমনটি জাহাজ থেকে থার্মোমিটার নামিয়ে দিয়ে নির্ণয় করা যায়। সেই সমুদ্র পানির গত এক লক্ষ বছরের তাপমাত্রার যে লেখচিত্র তৈরি করেন তার সাথে একই সময়ে মিলানকোভিচ নির্ণীত উষ্ণতার লেখচিত্রের বেশ মিল দেখা যায়। কাজেই কয়েকজন আবহাওয়াতত্ত্ববিদের আপত্তি "কয়েক ডিগ্রী উষ্ণতার পার্থক্য হিমবাহ যুগের সৃষ্টি করতে পারে না"—সত্ত্বেও মনে হয় সার্বিয়ান বিজ্ঞানীর মতই সঠিক ছিল। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যদিও গ্রহগুলি মনুষ্য-জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে না (যেমন জ্যোতিষীরা দাবি করে থাকে), তথাপি ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসের মতো দীর্ঘ সময়ান্তে এরা অবশ্যই মানুষ, প্রাণী ও বৃক্ষজগতের প্রভূত পরিবর্তন সাধন করে থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

অভিকর্ষ অতিক্রমণ

সেই প্রাচীন প্রবাদ—"যা-কিছু উপরে উঠবে অবশ্যই তা নিচে নামবে"—এখন আর সত্য নয়। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করা কিছু রকেট পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহরূপে বিরাজ করছে, যাদের জীবনকাল বেশ দীর্ঘ। আর কিছু রকেট চিরকালের জন্য আন্তঃ-নাক্ষত্রিক মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা মহাকর্ষ বিভবের ধারণার সাহায্যে আমরা অতি সহজে নির্ণয় করতে পারি কত বেগে কোন বস্তু পৃথিবী হতে ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হলে সেটি আর পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসবে না। আমরা সেখানে দেখেছি যে m ভরের কোন বস্তুকে ভূ-কেন্দ্র হ'তে পৃথিবীপৃষ্ঠের R দূরত্বে উপরে উঠতে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে তার পরিমাণ,

$$GMm\left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R}\right)$$

এখানে G অভিকর্ষ ধ্রুবক, M পৃথিবীর ভর এবং R_0 পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। বস্তু আর ফিরে আসতে সমর্থ না হলে R কে অবশ্যই ∞ (অসীম) হতে হবে বা $\frac{1}{R} = 0$ সুতরাং সে ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ

$$\frac{GMm}{R_0}$$

অন্যদিকে m ভরের কোন বস্তু v বেগে চলতে থাকলে তার গতিশক্তির পরিমাণ হবে $\frac{1}{2}mv^2$।

অতএব বস্তুকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে উঠার মতো যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি দিতে হলে অবশ্যই নিম্নের সমীকরণটির শর্ত পূরণ করতে হবে :

$$\frac{1}{2}mv^2 \geq \frac{GMm}{R_0}$$

banglainternet.com

এখানে $\geq$ চিহ্নটির অর্থ হচ্ছে "বৃহত্তর বা সমান"। যেহেতু সমীকরণটির উভয় পার্শ্ব থেকে m বাদ দেওয়া যেতে পারে, অতএব আমরা বলতে পারি—মাধ্যাকর্ষণের আওতার বাইরে নিয়ে বস্তুকে যে বেগে নিক্ষেপ করতে হবে তা ভারী ও হালকা যে কোন বস্তুর জন্য সমান হবে।

উপরের সমীকরণটি থেকে আমরা পাই, $V \geq \sqrt{\frac{2GM}{R_o}}$ এবং এখানে $R_o = ৬\cdot৩৭\times১০^{৮}$ সে.মি; $M = ৬\cdot৯৭\times১০^{২৭}$ গ্রাম; $G = ৬\cdot৬৬\times১০^{-৮}$ নিয়ে আমরা পাই,

বেগ $V = ১১\cdot২$ কিলোমিটার/সেকেণ্ড $= ২৫০০০$ মাইল/ঘণ্টা। এই বেগ তথাকথিত নিষ্ক্রমণ বেগ নামে পরিচিত—অর্থাৎ সেই নিম্নতম বেগ নিক্ষিপ্ত বস্তু আর ফিরে আসে না।

পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের উপস্থিতির জন্য ব্যাপারটি একটু জটিল হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী লেখক জুল ভার্নের "The Journey Around the Sun" পুস্তকের বর্ণনামতো কেউ যদি 'নিষ্ক্রমণ বেগে' কামান থেকে গোলা ছোঁড়ে তাহলে সেটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না; জুল ভার্নের বর্ণনাকে অসঙ্গত প্রমাণ করে তেমন বেগে নিক্ষিপ্ত গোলা বাতাসের সাথে ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট উত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং ভস্মীভূত গোলার অবশেষ সকল শক্তি হারিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। নিক্ষিপ্ত গোলার সাথে রকেটের তফাৎ নিম্নরূপ: একটি রকেট উৎক্ষেপনের স্থান হতে বেগ ধীরগতিতে যাত্রা শুরু করে এবং যতই উপরে ওঠে ততই তার বেগ বাড়তে থাকে। এভাবে গোড়ায় যেখানে বায়ু মণ্ডলের ঘনত্ব বেশী সেখানে অল্প বেগের কারণে ঘর্ষণে সৃষ্ট উত্তাপের উৎপত্তি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং যে উচ্চতায় রকেট তার পূর্ণবেগ প্রাপ্ত হয় সেখানে বায়ুর উপস্থিতি এত কম যে তা উড্ডয়নের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। অবশ্য বাতাসের বাধা গোড়ার দিকে কিছু শক্তির অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অল্প।

একটি রকেট তার সমস্ত জ্বালানী নিঃশেষ করে পৃথিবীর আবহমণ্ডল অতিক্রম করার পর মহাশূন্যের দিকে পাড়ি দিলে কি ঘটে, এখন আমরা

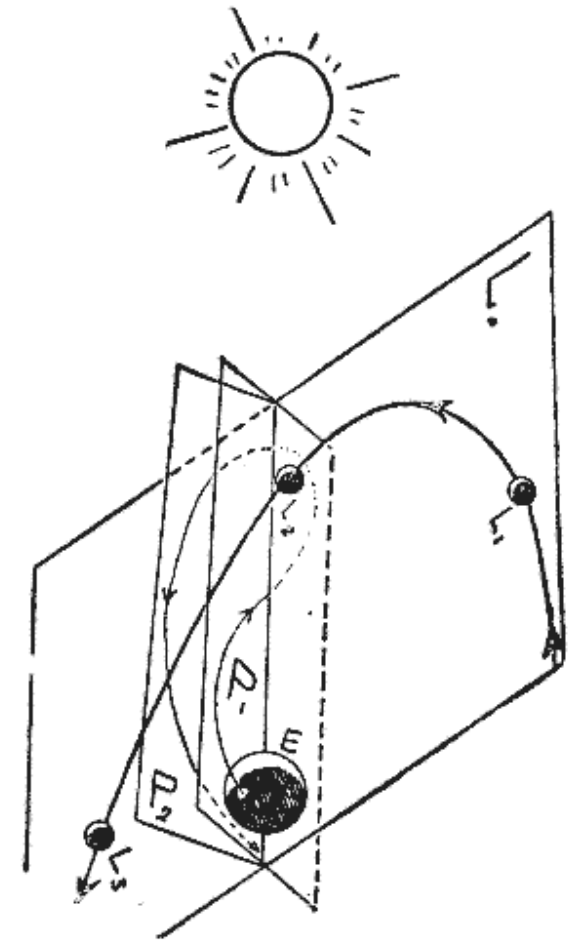

চিত্র ২১. চাঁদের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী প্রথম রকেটের কক্ষপথ।

সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। ২০ নং চিত্রে সৌরজগতের অন্তর্গত এলাকায় অবস্থিত গ্রহসমূহের (বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল) অবস্থান অংশে মহাকর্ষ বিভবের লেখচিত্র দেখানো হয়েছে। চিত্রে প্রধান ঢালটি (slope) সূর্যের মহাকর্ষ হতে উদ্ভূত যার মান GM/r, এখানে M সূর্যের ভর এবং r সূর্য হতে রকেটের দূরত্ব। এই সার্বিক ঢালের উপর চাপানো

banglainternet.com

আছে বিভিন্ন গ্রহের আকর্ষণের কারণে তৈরি 'স্থানীয় কূপ'। এ সকল কূপের গভীরতা সঠিক স্কেলে আঁকা হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রস্থ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ তা না হলে এগুলিকে শুধু খাড়া রেখার মতো দেখা যেত। চিত্রের ডান কোণের নিচের অংশে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মহাকর্ষ বিভবের মানের (বর্ধিত আকারে) ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। যেহেতু চন্দ্র পৃথিবীর দূরত্ব পৃথিবী-সূর্যের দূরত্বের চেয়ে অনেক কম এ জন্য এই অঞ্চলে সূর্যের মহাকর্ষ বিভবের মানের পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্তনীয়। সুতরাং চাঁদে কোন রকেট পাঠাতে হলে পৃথিবীর অভিকর্ষ অতিক্রম করার পর একটা যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে চাঁদে পৌঁছাতে পারে শুধুমাত্র এমন বেগ রকেটে সঞ্চার করতে পারলেই চলবে। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে রুশ বিজ্ঞানীরা রকেটের সাহায্যে এটা করতে সমর্থ হন এবং তাঁরা চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তোলেন। ২১ নং চিত্রে 'লুনিক' নামের রকেটের চাঁদে যাওয়া ও আসার পথ দেখানো হয়েছে।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের দিকে নিক্ষিপ্ত রকেটকে শুধু অভিকর্ষ অতিক্রম করলেই চলবে না, সূর্যের মহাকর্ষ-বাধাকেও কাটিয়ে উঠতে হবে। কোন রকেট পৃথিবীর অভিকর্ষ অতিক্রম করার পর এটি যে অবশিষ্ট অল্প বেগ নিয়ে চলে তাতে তা পৃথিবীর কক্ষপথের নিকট দিয়ে ঘুরতে বাধ্য হবে এবং সূর্যের খুব কাছে বা এর থেকে খুব দূরে যেতে পারবে না। পৃথিবীর নিকটবর্তী এই কক্ষপথ থেকে মুক্তি পেতে হলে রকেটটিতে সৌর মহাকর্ষের ঢাল অতিক্রম করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ বেগ থাকতে হবে। ২০ নং চিত্র থেকে দেখা যায় মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে আরোহণের জন্য রকেটকে পৃথিবীর আকর্ষণের গভীরতার ৬½ গুণ বেশী উচ্চতা অতিক্রম করতে হবে। যেহেতু বস্তুর গতিশক্তি তার বেগের বর্গের অনুপাতে বাড়ে এজন্য এরূপ একটি রকেটের বেগ কমপক্ষে $১১.২ \times \sqrt{৬.৫} = ২৮$ কিলোমিটার/সেকেণ্ড হওয়া প্রয়োজন।

তা'হলে মঙ্গলের উচ্চতায় উঠানোর মতো দুরূহ কাজের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কাজ, শুক্রগ্রহের কক্ষপথে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেই ভাল হয় না কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, রকেট উপরে উঠানো যত শক্ত নিচে নামানো ঠিক ততটা কঠিন। এর কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর

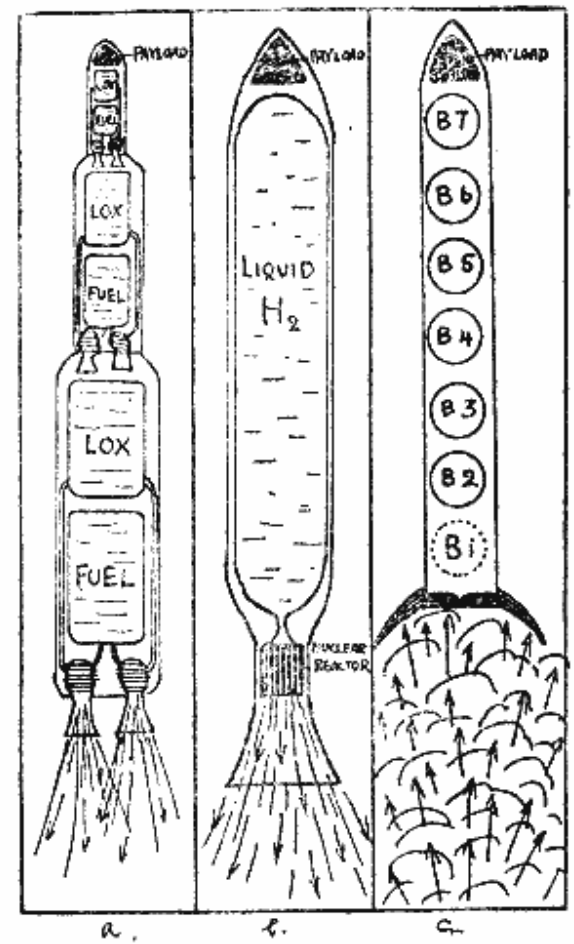

চিত্র ২২. (a) একটি বহুস্তরবিশিষ্ট রাসায়নিক রকেট; (b) প্রচলিত নিউক্লীয় রকেট; (c) অপ্রচলিত নিউক্লীয় রকেট।

অভিকর্ষ টান কাটিয়ে ওঠার পরও রকেট পৃথিবীর কক্ষপথে আবর্তন করবে; সূর্য হতে আরও দূরে নিতে হলে রকেটের বেগকে আরও বেশী পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং তার জন্য আরও অধিক পরিমাণ অতিরিক্ত জ্বালানীর দরকার পড়বে। অন্য দিকে সূর্যের নিকটবর্তী হওয়াটাও তার জন্য সহজ

BanglaInternet.com

নয়; শূন্যের মধ্য দিয়ে চালিত রকেট মোটরগাড়ির মতো ব্রেক কষে তার বেগকে কমাতে পারে না। রকেটের বেগ কমাতে হলে তার সামনের দিকে জেটের মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী গ্যাস-ধারা ছেড়ে দিতে হবে এবং বেগ সঞ্চারের জন্য পিছনের দিকে ধাবা দিতে যে জ্বালানীর প্রয়োজন হয় তার সমান জ্বালানীর প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু মঙ্গলের কক্ষ অপেক্ষা শুক্রের কক্ষ আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে অভিকর্ষ বিভবের মানের পার্থক্য পৃথিবীর অভিকর্ষ বিভবের মাত্র পাঁচগুণ এবং সেজন্যই শুক্রে রকেট প্রেরণের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। ১৯৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি রুশ মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা শুক্রের দিকে একটি রকেট পাঠিয়েছিলেন যেটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসে নি।

মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত রকেট জ্বালানী হিসেবে এ পর্যন্ত সাধারণ রাসায়নিক জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে এবং ২২ (ক) চিত্রে প্রদর্শিত একাধিক ধাপের মূলনীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে ছোট আকৃতির অনেক-গুলি রকেটের একটিকে অন্যটির উপর চাপিয়ে সবচেয়ে নিচেরটিতে অর্থাৎ তলার সবচেয়ে বড় আকৃতির রকেটের উর্ধ্বে মোটরকে অগ্নি-সংযোগের মাধ্যমে যাত্রা শুরুর জন্য চালু করা হয়। যখন এই আধুনিক টোটেম দণ্ডটি সর্বোচ্চ পরিমাণ উর্ধ্ব গতিবেগ অর্জন করে এবং প্রথম ধাপের রকেটের জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে যায় তখন এটাকে অবশিষ্ট ধাপ থেকে পৃথক করা হয় এবং দ্বিতীয় ধাপের রকেট মোটর চালু করা হয়। প্রক্রিয়াটি একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে শেষ ধাপে পৌঁছে এবং যন্ত্রপাতি, ইঁদুর, বানর, মানুষ ইত্যাদি যা এখানে থাকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় বেগে ত্বরান্বিত করে।

বর্তমানে পারমাণবিক শক্তি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মহাশূন্যযান চালানোর সমস্যাবলী সমুদ্রপোত বা আকাশযান চালানোর সমস্যাবলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। শেষোক্ত যান চালানোর জন্য শুধু শক্তির দরকার, কারণ এগুলি পানি বা বাতাসে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু শূন্যের মধ্যে তো আর ধাক্কা দেওয়া যায় না; এজন্য মহাশূন্যযানকে চলতে হয় এদের মঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোন প্রকার বস্তু নির্গমন করিয়ে এবং এই বস্তু আবার যান দ্বারাই বাহিত হয়। সাধারণ রাসায়নিক জ্বালানীর

রকেটের ক্ষেত্রে 'একের ভিতর দুই' ধরনের ব্যবস্থা থাকে; দু'টি পৃথক ট্যাঙ্কে বাহিত জ্বালানী, এবং জারণ পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয় আর বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট পদার্থই নজল দিয়ে নির্গত বস্তুকণারূপে ব্যবহারের যে সুবিধাটা পাওয়া যায় তা এজন্যই নস্যাৎ হয়ে যায় যে, এখানে যে পদার্থ (বেশীর ভাগ Co_2 ও জলীয় বাষ্প) তৈরি হয় তা ওজনে ভারী। জেটচালিত যানের মূলনীতি হ'তে জানা যায় যে গ্যাস যত ভারী হয় উৎপন্ন চাপও তত কম হয়।

সুতরাং জেট নির্গমনের জন্য সবচেয়ে হাল্কা রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেনের ব্যবহার সবচেয়ে সুবিধাজনক। কিন্তু হাইড্রোজেন একটি মৌলিক পদার্থ হওয়ায় কোন প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় না। এজন্য একটা ট্যাঙ্কভর্তি তরল হাইড্রোজেন নেওয়া যেতে পারে, তারপর কোন ধরনের পারমাণবিক চুল্লীর সাহায্যে এই হাইড্রোজেনকে উচ্চ উষ্ণতায় উঠানো যাবে। এ ধরনের পারমাণবিক শক্তিচালিত রকেটের চিত্র ২২খ-তে দেখানো হয়েছে।

রকেট চালানোর জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের অন্য একটি যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনার কথা সর্বপ্রথম লস আলামোস বিজ্ঞান গবেষণাগারের ডঃ স্টেনিস্লো উলম (Stanislaw Ulam) কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবের মূলনীতি ২২গ চিত্রে দেখানো হয়েছে। রকেটটিতে অনেক-গুলি আণবিক বোমা রাখা হয় এবং একটির পর একটি বোমা পেছন দিয়ে বের করে রকেট থেকে সামান্য দূরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। বিস্ফো-রণের ফলে সৃষ্ট বেগী বেগের গ্যাস রকেটকে ধরে ফেলবে এবং এর পেছনে আটকানো বৃহৎ চাকতির উপর চাপ প্রয়োগ করবে। এভাবে পর পর ধাক্কার ফলে রকেটের বেগ বাড়তে থাকে এবং পরিশেষে তা প্রয়োজনীয় বেগ প্রাপ্ত হবে। এ ধরনের রকেটের প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে পদ্ধতিটা পারমাণবিক চুল্লী দ্বারা উত্তপ্তকরণ রকেটের চেয়ে সুবিধাজনক হ'তে পারে।

সাধারণ পাঠকদের জন্য রচিত এ ধরনের একটি পুস্তকে মহাকাশ যাত্রায় অগ্রগতির সকল সম্ভাবনার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে আমরা এ অধ্যায়ের ইতি টানছি। আমাদের সৌরজগতের (বাইরেও হতে পারে) দূরবর্তী অংশে মহাশূন্যযান

banglainternet.com

পাঠাতে দু'টি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়; প্রথমত কিভাবে পৃথিবীর অভিকর্ষ এড়ানো যাবে এবং দ্বিতীয়ত তারপরে কিভাবে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছার মতো যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চার করা যাবে। এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তাতে রকেটকে যথেষ্ট প্রারম্ভিক বেগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অভিকর্ষ অতিক্রম করার পরও অনায়াস যাওয়ার মতো যথেষ্ট বেগ রকেটের থেকে যায়। অবশ্য এই দু'টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কেউ দু'টি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

ভূ-পৃষ্ঠ হ'তে উপরে উঠতে একটা প্রবল ধাক্কা দরকার। কারণ রকেট মোটরে সৃষ্ট ধাক্কাটা যথেষ্ট জোরালো না হলে রকেট উৎক্ষেপণ মঞ্চ হতে উপরে উঠবে না, শুধু ফোঁস ফোঁস করতে থাকবে। এ পর্যায়ে রাসায়নিক বা পারমাণবিক পদ্ধতির মতো শক্তিশালী উপায় দ্বারা রকেট চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। মহাশূন্যযানটি একবার উপরে উঠিয়ে কৃত্রিম উপ-গ্রহের কক্ষপথে নিয়ে যেতে পারলে ব্যাপারটি অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। যানটির গতি ত্বরান্বিত করার এখন প্রচুর অবকাশ মেলে এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ও স্বল্প ব্যয়-সাপেক্ষ পদ্ধতির ব্যবহার করা চলে। এখানেও রাসায়নিক বা কেন্দ্রীন শক্তির ব্যবহার চলতে পারে বা সৌরশক্তিও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, এখন আর তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, কারণ যানটির আর পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। মহাশূন্যযানকে আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের চারপাশে কক্ষপথে স্থাপন করলে তার গতিবেগ বাড়ানোর জন্য সময় পাওয়া যায় এবং যানটি আস্তে আস্তে চক্রাকার পথে ঘুরে ঘুরে অগ্রসর হওয়ার কালে তার লক্ষ্য সাধনের মতো যথেষ্ট বেগ সঞ্চয় করে। খুব সম্ভব ভবিষ্যত মহাকাশ ভ্রমণের বিপত্তির সমাধান আসবে প্রথমত একটা প্রবল ধাক্কা আর তার পরে ধীরে সুস্থে অনায়াসে পাড়ি দেওয়ার পদ্ধতি সংবলিত ব্যবস্থা হতে।

নবম অধ্যায়

আইনস্টাইনের অভিকর্ষতত্ত্ব

মহাকাশ বাশিন্দাদের গতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নিউটনীয় মতবাদের অসাধারণ সাফল্য পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগের সূচনা করে। কিন্তু মহাকর্ষ-ক্রিয়ার প্রকৃতি এবং বিশেষ করে জড়ভর ও মহাকর্ষ ভরের সমানুপাতিতা, যার কারণে সকল বস্তু একই হারে পড়তে থাকে, এ বিষয়ে আইনস্টাইনের ১৯১৪ সালে প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের আগে পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে অজানা থেকে যায়। এর দশ বছর আগে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রচার করেন। এখানে তিনি প্রমাণ করেন যে কোন বন্ধ কক্ষে কোন প্রকারের পর্যবেক্ষণ দ্বারা বলা সম্ভব নয় যে কক্ষটি স্থির আছে কিংবা সমবেগে সরলপথে চলছে, এমনকি যদি কক্ষটিকে একটি আধুনিক গবেষণাগারে রূপান্তরিত করা যায়, তবুও না। এর উপরে ভিত্তি করে আইনস্টাইন পরম সমবেগের ধারণা বাতিল করে দেন; প্রাচীন ও পরস্পর-বিরোধী ধারণাযুক্ত 'ঈথার জগতকে' স্থানচ্যুত করেন এবং পদার্থবিদ্যার যুগান্তকারী মতবাদ আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত শান্ত সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে বা নিশ্চল বাতাসে ভেসে চলা উড়োজাহাজের মধ্যে কোন যান্ত্রিক, আলোক-তত্ত্বীয় বা অন্য কোন ভৌত পরিমাপের পরীক্ষা করা হলে (এই নিবন্ধটি এস. এস. কুইন এলিজাবেথ-এর একটি কেবিনে লেখা হচ্ছে) এমন কোন ফল পাওয়া যাবে না যার সাহায্যে বলা সম্ভব যে জাহাজটি নোঙর করা আছে বা ভেসে চলছে, অথবা উড়োজাহাজটি ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা আকাশে উড়ে চলছে। কিন্তু যদি সমুদ্র বিক্ষুব্ধ থাকে বা জাহাজটি কোন তুষারখণ্ডকে আঘাত করে কিংবা উড়োজাহাজটি পর্বতশীর্ষে ধাক্কা খায় তাহলে অবশ্য সম্পূর্ণরূপে বলে যায় এবং সমবেগ হতে বিচ্যুতি বেদনাদায়কভাবে ধরা পড়ে।

এই সমস্যার মোকাবেলার জন্য আইনস্টাইন নিজেকে আধুনিক মহা-শূন্যচারীর ভূমিকায় কল্পনা করেছিলেন এবং আকর্ষ পকারী বৃহৎ পদার্থ হতে

banglainternet.com

অনেক দূরে একটা মহাশূন্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (চিত্র-২৩) নানাপ্রকারের ভৌত পরীক্ষার ফলাফল বিচার বিবেচনা করেছিলেন। দূরবর্তী নক্ষত্রের

চিত্র ২৩. কাল্পনিক রকেটে আলবার্ট আইনস্টাইন।

তুলনায় গতিশীল অথবা নিশ্চল এইরূপ একটি মহাশূন্য কেন্দ্রের অভ্যন্তরে পর্যবেক্ষক নিজে অথবা তাঁর গবেষণাগারের যে সকল যন্ত্রপাতি দেয়ালে আটকানো নেই সেগুলি কক্ষের ভেতরে ভাসতে থাকবে। সেখানে ঊর্ধ্ব

অথবা অধঃ দিকের কোন প্রভেদ থাকবে না। কিন্তু যেইমাত্র রকেটের মোটর চালু করে কেন্দ্রটি কোন নির্দিষ্ট দিকে যাত্রা করবে তখনি মহাকর্ষের উপস্থিতির মতো ফলাফল লক্ষ্য করা যাবে; লোকজন, জিনিসপত্র রকেট মোটরের সংলগ্ন দেয়ালের দিকে ধাবিত হবে; এই দেয়াল মেঝে আর উলটা দিকের দেয়াল ছাদ হিসাবে কাজ করতে থাকবে; লোকজন তাদের পায়ের উপর খাড়া হয়ে ঠিক মাটির ওপর যেমন হাঁটে তেমনি হাঁটতে পারবে। সর্বোপরি যদি কেন্দ্রটির ত্বরণ ভূ-পৃষ্ঠে অভিকর্ষ ত্বরণের সমান হয় তাহলে সেখানকার লোকজনের বিশ্বাস জন্মাবে যে তাদের মহাশূন্য কেন্দ্রটি এখনও উৎক্ষেপন মঞ্চে রয়েছে।

মনে করা যাক, এই 'ছদ্ম অভিকর্ষের' (Pseudo-gravity) ধর্ম পরীক্ষার জন্য কোন ত্বরিত রকেটের অভ্যন্তরে একজন পর্যবেক্ষক একটি লৌহ ও একটি কাষ্ঠ নির্মিত গোলক এক সাথে ছেড়ে দিল। 'প্রকৃতপক্ষে' এর ফলাফল নিম্নরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে: গোলক দু'টি পর্যবেক্ষকের হাতে থাকাকালে রকেটের ত্বরণে চলতে থাকবে। কিন্তু যে মুহূর্তে গোলকগুলি হাত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, রকেটের শরীরের সাথে এদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কালের গতিবেগের সমান বেগে তারা পাশাপাশি চলতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে রকেট-জাহাজের ক্রমাগত বেগবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং শীঘ্রই এর মেঝে গোলকগুলিকে ধরে ফেলে এবং এদেরকে একসঙ্গে আঘাত করে। যে পর্যবেক্ষক-গোলক দু'টি ছেড়ে দিয়েছে তার কাছে ব্যাপারটি অন্যরকম মনে হবে। সে দেখতে পাবে, গোলক দু'টিই নিচে পড়ছে এবং পরিশেষে একসঙ্গে মেঝেতে আঘাত করছে। সে পিসা টাওয়ারে গ্যালিলিও'র পরীক্ষার কথা স্মরণ করে নিঃসন্দেহ হবে যে এখানে নিশ্চয়ই একটা মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের অস্তিত্ব আছে।

গোলকদ্বয় কিভাবে পড়বে তার দু'টি বর্ণনাই সমান সত্যি এবং আইনস্টাইন দুই দৃষ্টিকোণের সমতাকে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদভিত্তিক নতুন মহাকর্ষ মতবাদের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করেন। ত্বরিত কক্ষের ভিতরে পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মিল সমতার নীতি নামে পরিচিত; নীতিটিই শুধুমাত্র বলবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে

BanglaInternet.com

এটি নিতান্তই একটা অকিঞ্চিৎকর নীতি বলে পরিগণিত হ'ত। আইনস্টাইনের ধারণা, সমতার নীতিটি সার্বিকভাবে আলোক ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

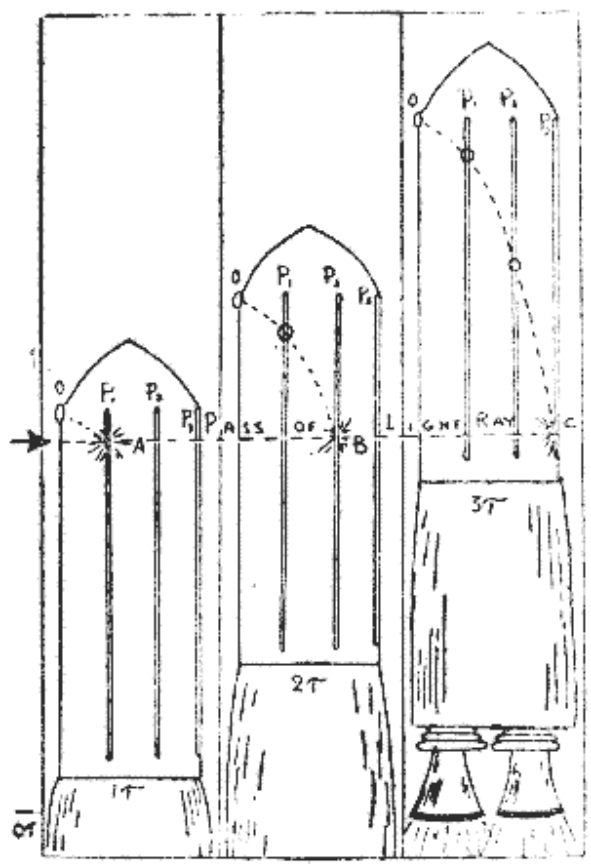

চিত্র ২৪. ত্বরিত রকেটে আলোক সঞ্চারণ।

আলোক-রশ্মি যখন আমাদের মহাশূন্যযান-কক্ষের ভিতর দিয়ে এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে যায়, তখন আলোক-রশ্মির অবস্থা লক্ষ্য করা যাক। আমরা আলোর পথে একসারি প্রতিপ্রভ (fluorescent) কাঁচের প্লেট

স্থাপন করে এর পথকে দৃশ্যমান করতে পারি বা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে খুব সহজে আলোর পথটি চিহ্নিত করতে পারি। আলো যখন সমান দূরত্বে রাখা কতিপয় কাঁচের প্লেট পার হয়ে যায় তখন প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে তা ২৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। 'ক' চিত্রে আলো প্রথম প্লেটের উপরের অংশে আঘাত করে এবং প্রতিপ্রভ (fluorescent) বিন্দু তৈরি করে। 'খ' চিত্রে আলো দ্বিতীয় প্লেটের মাঝের অংশে প্রতিপ্রভ (fluorescent) বিন্দু তৈরি করেছে। 'গ' চিত্রে আলোক-রশ্মি তৃতীয় প্লেটকে আরও নিচে আঘাত করেছে। রকেটের গতি ত্বরিত গতি বলে দ্বিতীয় সময়-অন্তরে রকেট প্রথম সময়-অন্তর অপেক্ষা তিনগুণ দূরত্ব অতিক্রম করবে এবং সে জন্যই প্রতিপ্রভ বিন্দু তিনটি এক সরলরেখায় না থেকে নিচের দিকে বাঁক নেওয়া একটি বক্ররেখার (অধিবৃত্ত) উপর অবস্থান করবে। যানকক্ষের পর্যবেক্ষক মনে করবে এখানকার এই ঘটনার জন্য দায়ী মহাকর্ষ-ক্ষেত্র। এজন্য আলোর এই পরীক্ষা থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত হবে যে, আলোক-রশ্মি মহাকর্ষ-ক্ষেত্র অতিক্রম করার কালে বেঁকে যায়। এ জন্যই আইনস্টাইন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে যদি সমতার নীতি পদার্থবিদ্যার একটি সার্বিক নীতি হয় তাহলে দূরবর্তী নক্ষত্র হতে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে আগত রশ্মি সূর্যের নিকট দিয়ে আসার সময় রশ্মিটি বেঁকে যাবে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ১৯১৯ সালের গ্রহণ দ্বারা সুন্দরভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল; এসময় আফ্রিকা গমনকারী একদল বৃটিশ অভিযাত্রী দেখতে পেয়েছিলেন গ্রহণ-আক্রান্ত সূর্যের নিকটের তারকার নির্দিষ্ট পরিমাণ বিচ্যুতি। এভাবেই ত্বরিত বেগ ও মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের সমতার নীতি পদার্থবিদ্যায় একটি তর্কাতীত বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন আমরা আর এক প্রকারের ত্বরিত বেগ এবং মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের সাথে তার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা শুরু করবো। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বেগের মান পরিবর্তনের কথা বলেছি, কিন্তু তার দিক সম্পর্কে কিছু বলিনি। এছাড়া আরেক প্রকারের গতি আছে যেখানে বেগের পরিমাণ স্থির থাকলেও দিকের পরিবর্তন হয়— এই গতির নাম ঘূর্ণনগতি। একটা ঘূর্ণনশীল মঞ্চ কল্পনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, মঞ্চটি পর্দা দিয়ে ঘেরা, যেন মঞ্চে দাঁড়ানো লোক বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে না পারে যে মঞ্চটি (চিত্র-২৫) ঘুরছে না থেমে আছে। সবাই জানেন যে,

banglainternet.com

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উপরে কোন ব্যক্তি কেন্দ্রাতিগ বল অনুভব করেন; এই বল তাঁকে বাইরের দিকে ঠেলে এবং মঞ্চে রাখা একটি বলকে গড়িয়ে কেন্দ্র হ'তে দূরে সরিয়ে দেয়। মঞ্চের উপরের বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল কেন্দ্রাতিগ বলের মান বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল বলে এখানকার পরিস্থিতিকে আমরা মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের পরিস্থিতির সমতুল্য মনে করতে পারি। কিন্তু এই মহাকর্ষ-ক্ষেত্রটা সূর্য বা পৃথিবীর চারপাশে অবস্থিত মহাকর্ষ-ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও কিছুটা বিচিত্র প্রকৃতির। প্রথমত এখানে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ দেখা যায় এবং তা দূরত্বের বর্গের সাথে না কমে দূরত্বের সাথে বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত ক্ষেত্রটি কেন্দ্রীয় ভরের চারপাশে গোলক বরাবর সুষম না হয়ে মঞ্চের ঘূর্ণন-অক্ষের বরাবর একটি অক্ষ নিয়ে সিলিণ্ডার কল্পনা করলে সেখানে সুষম দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে আইনস্টাইনের সমতার নীতি প্রযোজ্য হয় এবং প্রতিসাম্যতার অক্ষের চারপাশে অবস্থিত আকর্ষণকারী পদার্থের মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের দ্বারা উপযুক্ত ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা যায়।

এরকম একটা মঞ্চে ভৌত ঘটনাসমূহের যে ফল লক্ষ্য করা যায় তার ব্যাখ্যা আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা মতবাদের সাহায্যে করা যাবে। এই মতবাদ অনুসারে গতির ফলে দৈর্ঘ্য ও সময়ের মাপের তারতম্য ঘটে। এই মতবাদের দু'টি মৌলিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে: ১. যদি কোন বস্তু V বেগে আমাদের অতিক্রম করে তাহলে বস্তুটি আমাদের কাছে বেগের দিকে $\sqrt{1-v^2/c^2}$ অনুপাতে স্ফুরিত হয়েছে বলে মনে হবে; এখানে C হচ্ছে আলোর বেগ। সচরাচর দৃষ্ট বেগসমূহ আলোর বেগের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর এবং উক্ত অনুপাতের মান একের কাছাকাছি বলে বস্তুর কোন লক্ষণীয় সঙ্কোচন দেখা যাবে না। কিন্তু V-এর মান C-এর কাছাকাছি হলে ফলটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ২. কোন ঘড়িকে যদি আমরা নিজেদেরকে V বেগে অতিক্রম করতে দেখি তাহলে একে আমরা সময় হারাতে বা আস্তে চলতে দেখব। এখানেও এর আস্তে চলার হার $1/\sqrt{1-v^2/c^2}$

দূরত্বের সঙ্কোচনের মতো এ ফলটির গুরুত্ব তখনই লক্ষ্য করা যাবে যখন V বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হবে।

এ দু'টি ফলের কথা স্মরণ রেখে এখন ঘূর্ণনশীল মঞ্চের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ফলের বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক। মনে করুন, মঞ্চের

বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে আলোর চলার সূত্রটি আমরা জানতে ইচ্ছা করি। এ জন্য আমরা মঞ্চের পরিধির উপরে দু'টি বিন্দু A ও B (চিত্র ২৫ক) নির্ধারিত করি; বিন্দু দু'টির একটি আলোক-উৎস এবং অন্যটি আলোর

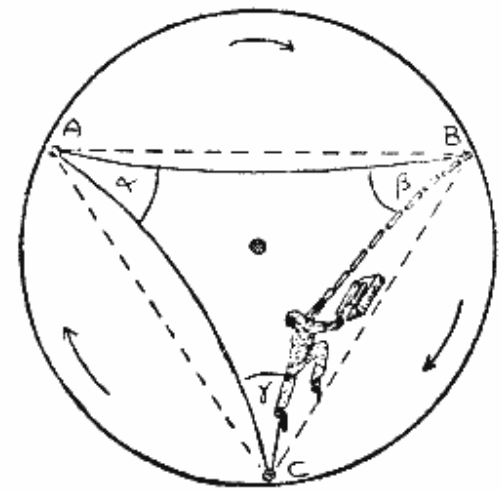

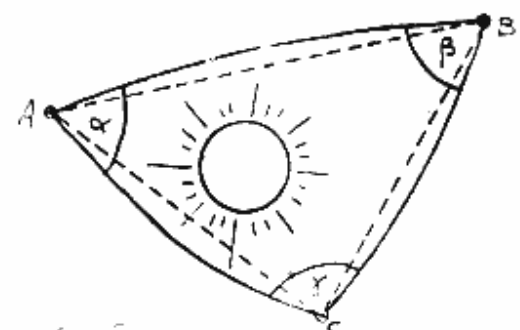

চিত্র ২৫. (a) ঘূর্ণনশীল মঞ্চে কয়েকটি পরীক্ষা (b) সূর্যের চারদিকে ত্রিভুজাকৃতি

গ্রহীতা রূপে কাজ করবে। আলোক-তত্ত্বের মৌলিক সূত্রানুসারে আলো সবসময় সংক্ষিপ্ততম পথে গমন করে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে A ও B বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ কোনটি? A ও B বিন্দুর মধ্যে সংযোগকারী

banglainternet.com

যে-কোন রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য আমরা এখানে পুরনো কিন্তু সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা, মাপকাঠি ফেলে মাপার পদ্ধতি গ্রহণ করব। কতটা মাপকাঠি একটার পর একটা রাখলে A থেকে B-তে পৌঁছা যাবে? মঞ্চ ঘুরতে না থাকলে A ও B বিন্দুর মাঝের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ অবশ্যই সনাতন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সরলরেখা বরাবর হ'ত। কিন্তু মঞ্চ ঘুরতে থাকায় AB সরলরেখা বরাবর রাখা মাপকাঠি নির্দিষ্ট বেগে চলতে থাকবে। ফলে কাঠির দৈর্ঘ্য আপেক্ষিকতাভিত্তিক সঙ্কোচনের কবলে পড়বে এবং AB দূরত্ব মাপতে বেশী সংখ্যক মাপকাঠির প্রয়োজন পড়বে। অবশ্য এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখা যাবে; মাপের কাঠিকে মঞ্চের কেন্দ্রের দিকে সরিয়ে আনলে কাঠির রৈখিক বেগ কমে যায়, ফলে সঙ্কোচনের পরিমাণ কাঠি দূরে থাকলে যা হ'ত তার চেয়ে কম হবে। এজন্যই মাপ-কাঠির সারিকে কেন্দ্রের দিকে সরিয়ে আনলে AB দূরত্ব বেড়ে গেলেও সঙ্কোচনের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য 'A' থেকে 'B'-তে যেতে কমসংখ্যক কাঠির দরকার পড়বে। এখন যদি কাঠির পরিবর্তে আলোক-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত হবে আলোক-তরঙ্গ ও মহাকর্ষের দিক বরাবর বেঁকে যায়; এখানে বেঁকে যাওয়ার দিকটি হচ্ছে কেন্দ্র হ'তে দূরে।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চ পরিত্যাগের পূর্বে আরেকটা পরীক্ষা করে নেওয়া যাক। দু'টি একই রকমের ঘড়ির একটিকে মঞ্চের কেন্দ্রে এবং আরেকটিকে পরিধিতে স্থাপন করি। এ অবস্থায় প্রথম ঘড়িটি স্থির আর দ্বিতীয় ঘড়িটি গতিশীল; ফলে শেষের ঘড়িটি আস্তে চলবে। কেন্দ্রাভিমুখী বলকে মহাকর্ষ বল রূপে বিবেচনা করলে দেখা যাবে উচ্চ মহাকর্ষ বিভবে রাখা ঘড়িটি (যে দিকে মহাকর্ষ বল কাজ করে) আস্তে চলে। এই আস্তে চলা সকল প্রকারের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর প্রথম তলায় যে মহিলা টাইপিস্ট কাজ করছে তার বয়সবৃদ্ধি ঐ বিল্ডিং-এর সর্বোচ্চ তলায় কর্মরত তার যমজ বোনের চেয়ে আস্তে হচ্ছে। অবশ্য এই তারতম্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। হিসাব করে দেখা যাবে প্রথম তলার মহিলা তার যমজ বোন থেকে দশ বছরে এক সেকেণ্ডের কয়েক লক্ষ অংশ পরিমাণ কম বয়সী হবেন। সূর্যপৃষ্ঠ ও পৃথিবীপৃষ্ঠের মাঝে মহাকর্ষের পার্থক্যের জন্য এই ফল আরও অনেক বেশী হবে। সূর্যপৃষ্ঠে রক্ষিত একটা ঘড়ি পৃথিবীপৃষ্ঠের একটা ঘড়ি থেকে এক

শতাংশের দশহাজার ভাগের এক ভাগ আস্তে চলবে। অবশ্য সূর্যপৃষ্ঠে ঘড়ি রেখে তার সময় দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু সৌর আবহাওয়ায় উপস্থিত পরমাণুর বর্ণালী রেখার কম্পন-সংখ্যার পর্যবেক্ষণ থেকে হিসাব করে ঘড়ির আস্তে চলার এই পরিমাণটি যাচাই করা হয়েছে।

যমজ বোনদের বিভিন্ন মহাকর্ষ-বিভবে কাজ করার জন্য তাদের বয়স-বৃদ্ধির হারের তারতম্যের প্রশ্নটি যমজ ভাইদের বয়স-সংক্রান্ত সমস্যার অনুরূপ; দুই ভাইয়ের একজন বাড়িতে থাকেন, অন্যজন প্রচুর ভ্রমণ করেন। মনে করা যাক, যমজ ভাইদের একজন মহাশূন্যযানের চালক এবং অন্যজন ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত মহাশূন্যকেন্দ্রের কর্মচারী। চালক-ভ্রাতা দূরবর্তী কোন নক্ষত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো; এই যাত্রায় তার যানের বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি আর যে সময়ে তার ভাই ভূ-পৃষ্ঠেই কাজে ব্যাপৃত রইলো। আইনস্টাইনের মতে, প্রত্যেক ভ্রাতারই বয়সবৃদ্ধি অন্য ভ্রাতা অপেক্ষা আস্তে হ'তে থাকবে। এভাবে চালক-ভ্রাতা যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবে তখন সে আশঙ্কা করতে থাকবে যে সে তার ভাই অপেক্ষা বেশী বুড়িয়ে গেছে এবং অন্যদিকে অফিসের ভাই ঠিক এর উল্টো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে। অবশ্য এ ধরনের পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত অর্থহীন, কেননা চুলের পকতা থেকে যদি বয়সের হিসাব করা যায় তাহলে সহজেই দুই ভাই পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নির্ণয় করতে পারবে কার বয়স বেশী বেড়েছে।

এই আপাতঃবিভ্রান্তির উত্তরে বলা যায় যে, যমজদের বয়সের এরূপ তুলনামূলক বৃদ্ধি কেবলমাত্র বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে সঠিক, যেখানে সমরূপবেগে গমনেরই একমাত্র বিবেচনার বিষয়। এক্ষেত্রে চালক-ভ্রাতা কোনদিনই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না এবং সম্ভবত অফিসে কর্মরত ভ্রাতার পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের পকতা থেকে বয়সের তুলনা করতে পারবে না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি দুই ভাই দু'টি টেলিভিশন সেট সামনে রাখতে পারে যার একটিতে অফিসে কর্মরত ভ্রাতাকে মাথার উপরে ঝোলানো ঘড়িসহ ডেস্কে বসে থাকতে দেখা যাবে এবং অন্যটিতে দেখা যাবে মহাশূন্যযানের ককপিটে আসীন চালক-ভ্রাতা ও তার ঘড়িটি (চিত্র-২৫)।

banglainternet.com

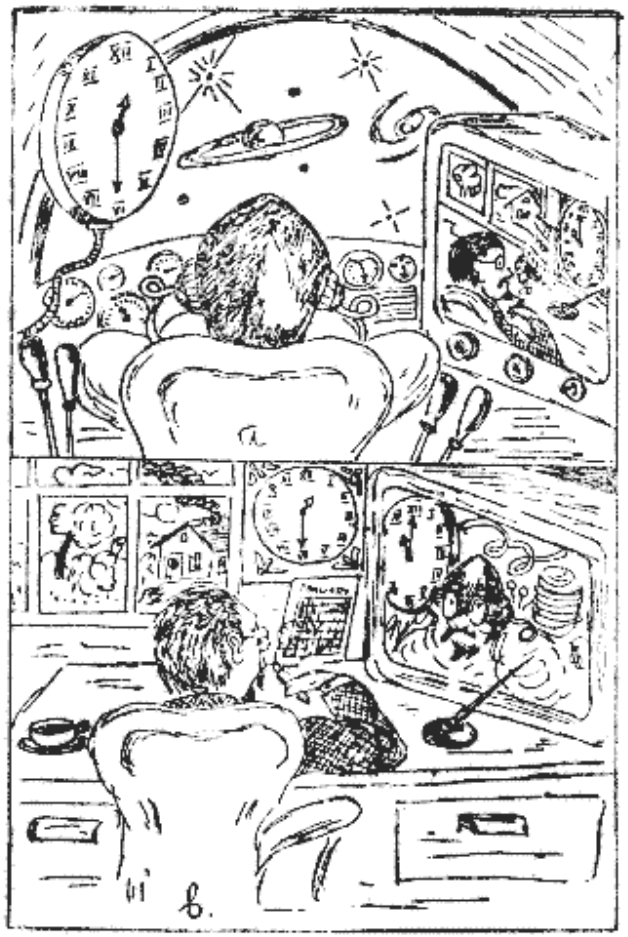

চিত্র ২৬. টিভি পেটে পরিলক্ষিত যমজ ভাইদের আপেক্ষিক বয়স বৃদ্ধি।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ইউজিন ফীনবার্গ (Eugene Feenberg) রেডিও-সঙ্কেত চলাচলের সুপরিচিত সূত্রের সাহায্যে এই বিষয়টির তাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে দিলেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল হ'ল এই যে, প্রত্যেক ভাই তার টিভিতে অন্য জনকে অধিকতর আস্তে বুড়িয়ে যেতে দেখবে। কিন্তু যদি চালক-ভাইকে ফিরে আসতে হয় তাহ'লে তাকে প্রথমত তার

যানের গতি মন্দীভূত করে, তারপর একদম থামিয়ে ফেলতে হবে এবং এরপর বাড়ির পথে যানটিকে ত্বরিত করতে হবে। এর ফলে এখন আবার যমজ ভাইদের অবস্থা অন্যরকম হয়ে পড়বে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ত্বরণ ও মন্দন মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের সমতুল্য যেখানে ঘড়ির কাঁটা এবং অন্যান্য ঘটনাকাল মন্থরতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক যেমন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সর্বোচ্চ তলায় কর্মরত বোনের বয়সের চেয়ে সর্বনিম্নতলার বোনের বয়স আস্তে বাড়ে তেমনি চালক-ভাতার বয়স তার অফিসের কর্মরত ভ্রাতার চেয়ে আস্তে বাড়বে। সুতরাং মহাশূন্য ভ্রমণ যদি যথেষ্ট দীর্ঘ হয় তাহ'লে চালক-ভ্রাতা যাত্রাশেষে ফিরে তার কালো গোঁফে তা দিতে দিতে দেখতে পাবে তার যমজ ভাই-এর টাকপড়া উজ্জ্বল, মসৃণ মস্তকটি। সুতরাং এখানে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে ঘড়ির আস্তে চলার সত্যতা নিরূপণের (যদি আরও যাচাইয়ের প্রয়োজন থাকে) একটি মজাদার পরীক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এস. এফ. সিঙ্গার (S.F. Singer)। তাঁর প্রস্তাবটি ছিল, একটি পারমাণবিক ঘড়িকে কৃত্রিম উপগ্রহে রেখে উপগ্রহটিকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিভিন্ন উচ্চতায় স্থাপন করে বৃত্তাকার পথে গতিশীল করা। হিসাব করে দেখা গেছে যে, আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধের চেয়ে কম উচ্চতায় আপেক্ষিকতাভিত্তিক যে ফলটি গুরুত্বপূর্ণ হবে তা হচ্ছে গতির জন্য ঘড়ির $\sqrt{1-v^2/c^2}$ অনুপাতে আস্তে চলা। উচ্চতা অধিক হলে বেগের কারণে আস্তে চলার ফলটি অপ্রধান হয়ে দাঁড়াবে এবং ঘড়িটি সময় হারানোর পরিবর্তে সময় লাভ করবে (দ্রুত চলবে)। কারণ ঘড়িটি তখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে অবস্থান করবে (যেমন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সর্বোচ্চ তলায় কর্মরত যমজ বোন)। এই মজার পরীক্ষাটি যে আইনস্টাইনের মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

বর্তমান আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মহাকর্ষ-ক্ষেত্র দিয়ে চলা আলোক-রশ্মি সরলপথে যায় না, পরিবর্তে তা মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের দিকে বেঁকে যায় এবং মাপকাঠির সঙ্কোচন হেতু দু'টি বিন্দুর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ততম পথটিও সরলরেখার পরিবর্তে মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের দিকে বাঁকানো বক্ররেখা।

banglainternet.com

তাহলে শূন্যের মধ্যে আলোর পথ বা দুই বিন্দুর মধ্যবিন্দু সংক্ষিপ্তম পথ ছাড়া সরলরেখার আর কি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে? আইনস্টাইনের মত ছিল, মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে সরলরেখার পুরাতন ধারণাকে ঠিক রাখা, কিন্তু আলোর পথ বা দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্তম পথকে বক্র না বলে বলা উচিত যে স্থানটি নিজেই বক্র। ত্রিমাত্রার বক্র স্থানের ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন এবং তার চেয়েও কঠিন চারমাত্রার বক্রদেশের ধারণা। সেখানে সময় চতুর্থ মাত্রা বা স্থানাঙ্কের কাজ করে। সবচেয়ে ভালো হয়, আমাদের পরিচিত দুই মাত্রার তলের সাথে এর সাদৃশ্য কল্পনা করা। আমরা সমতলের ইউক্লিড জ্যামিতির সাথে পরিচিত; এখানে সমতল বা চ্যাপ্টা ক্ষেত্রে আঁকা বহুবিধ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু সমতলের পরিবর্তে যদি বক্রতলের উপরে জ্যামিতিক ক্ষেত্র আঁকা যায়, যেমন গোলকের উপরে, তাহলে সেখানে ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রযোজ্য হয় না। ২৭নং চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে; এখানে ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে (ক) সমতলের উপরে (খ) গোলকতলের উপরে এবং (গ) এমন একটি তলে যাকে 'ঘোড়ার জিনের তল' (Saddlesurface) বলা যেতে পারে।

সমতলে অঙ্কিত ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০°। গোলকতলে অঙ্কিত ত্রিভুজের তিন কোণ ১৮০°-এর চেয়ে কম। গোলক ও ঘোড়ার জিনের তলে অঙ্কিত ত্রিভুজের বাহুগুলি তিনমাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে সোজা নয় সত্যি, কিন্তু এগুলিই সবচেয়ে সোজা পথ। অর্থাৎ তল ত্যাগ না করে দু'টি বিন্দুর মাঝের সংক্ষিপ্তম পথ। নামকে বিভ্রান্তির কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য গণিতবিদরা এই রেখাগুলিকে জিওডেসিক রেখা বা শুধু জিওডেসিক বলেন।

একইভাবে আমরা ত্রিমাত্রার ক্ষেত্রে জিওডেসিকাল রেখা বা ক্ষুদ্রতম রেখা বলতে পারি তাকেই যে-পথে দু'টি বিন্দুর মধ্যে আলোকরশ্মি গমন করে; এবং যে স্থানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি মেপে ১৮০° পাব সে স্থানকে বলব সমতল, ১৮০°-এর বেশী হ'লে বলব দেশ গোলকতলের মতো বা বক্রতা ধনাত্মক আর দেশের বক্রতা ঋণাত্মক বা ঘোড়ার পিঠের মতো যদি তিন কোণের সমষ্টি ১৮০° অপেক্ষা কম হয়। কল্পনা করা যাক, তিনজন জ্যোতির্বিদ পৃথিবী, শুক্র এবং মঙ্গলে দাঁড়িয়ে এই গ্রহগুলির মাঝে আলোক গমনকারী পথের দ্বারা তৈরি ত্রিভুজের কোণের সমষ্টি নির্ণয়

করছে। যেহেতু আমরা দেখেছি যে, সৌর মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে আলো ক্ষেত্রের দিকে বেঁকে যায় এজন্য এ অবস্থাটা দেখতে ২৫খ-চিত্রের মতো হবে এবং ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি ১৮০° অপেক্ষা বেশী হবে। এ অবস্থার জন্য যদি বলা হয়, আলো সংক্ষিপ্তম পথে বা জিওডেসিক পথে চলে, কিন্তু সূর্যের চারপাশের স্থানের বক্রতা ধনাত্মক তাহলে উক্তিটা যুক্তিযুক্ত হবে। অনুরূপভাবে সূর্যসমান গোলাকার মঞ্চের কেন্দ্রাভিমুখী বলক্ষেত্রের সমতুল্য মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের স্থানকে ঋণাত্মক দিকে বক্র বলে বিবেচনা করতে হবে।

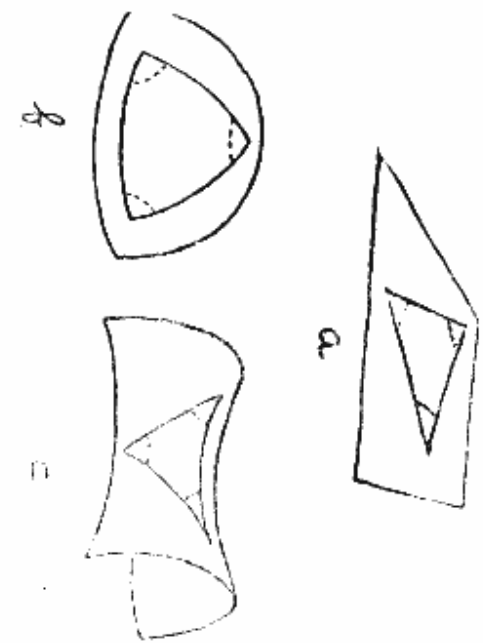

চিত্র ২৭. (a) সমতলপৃষ্ঠে ত্রিভুজ (b) গোলক ও ঘোড়ার জিনাকৃতি পৃষ্ঠ।

আইনস্টাইনের অভিকর্ষ সম্পর্কিত জ্যামিতিক মতবাদের ভিত্তি উপরের যুক্তিতর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতবাদ পুরনো নিউটনীয় মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূরকরূপে কাজ করে। এই মতবাদ অনুসারে সূর্য তার

banglainternet.com

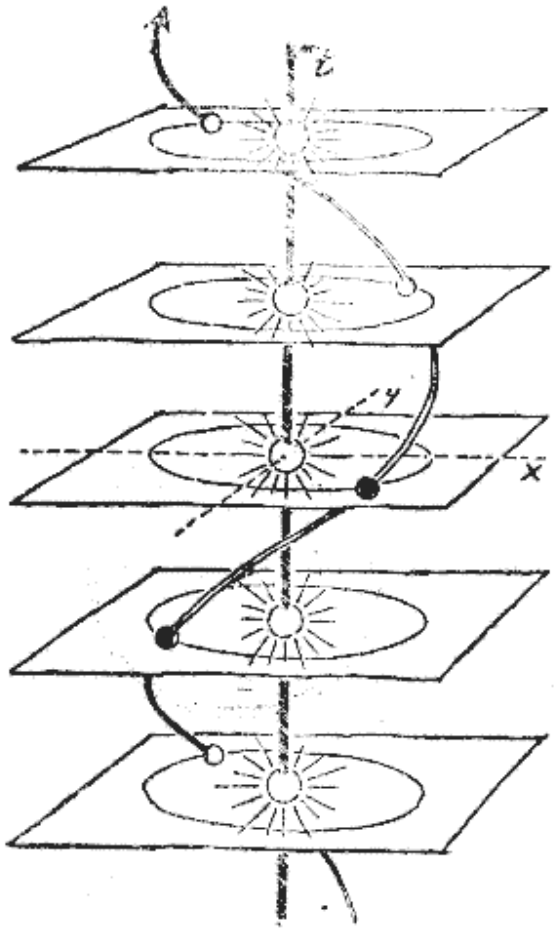

চারপাশের দেশে এমন নির্দিষ্ট বলক্ষেত্র তৈরি করে যার ফলে গ্রহসমূহ সরলপথ হ'তে বিচ্যুত হয়ে বক্রপথে ঘুরতে বাধ্য হয়। আইনস্টাইনের

চিত্র ২৮. দেশকাল পরিমণ্ডলে ঘূর্ণনরত পৃথিবীর বিশ্বরেখা। এখানে উলম্ব সময়-অক্ষ *t* এবং দেশ-অক্ষ *x* ও *y* স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে।

বর্ণনায়---নিজে বক্র এবং এই বক্রদেশে গ্রহসমূহ সবচেয়ে সোজাপথ অর্থাৎ জিওডেসিক পথে ভ্রমণ করে। বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বলা

প্রয়োজন যে, এখানে চার মাত্রার দেশ-কালে (space-time) জিওডে-সিকের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কক্ষপথটি তিনমাত্রার দেশেই যে-জিওডেসিক এমনটা বলা ভুল হবে। বিষয়টি চিত্রিত করা হয়েছে ২৮ নং চিত্রে; এখানে সময়-অক্ষ t এবং x, y কক্ষতলে অবস্থিত স্থানাঙ্ক নির্ণায়ক অক্ষ। প্যাঁচানো রেখাটি কোন বস্তুর (এ ক্ষেত্রে পৃথিবী) জগতরেখা এবং এই পথই দেশ-কালের পরিমন্ডলে* জিওডেসিক রেখা। দেশ-কালের বক্রতা-রূপে মহাকর্ষের আইনস্টাইনীয় ব্যাখ্যা সনাতন নিউটনীয় মতবাদ হ'তে সামান্য পরিবর্তিত ফল প্রদান করে এবং পরীক্ষার সাহায্যে সত্যতা যাচাইয়ের দুয়ার খোলা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, এই মতবাদ বুধগ্রহের বৃহৎ অক্ষের প্রতি শতাব্দীতে ৪৩ কৌণিক সেকেন্ড পরিমাণ প্রগমনের ব্যাখ্যা দিয়ে সনাতন নভোকাশ বলবিদ্যার একটি দীর্ঘদিনের রহস্যের সমাধান করেছে।

* এখানে অবশ্যই লক্ষণীয় যে ২৮নং চিত্রের উলম্ব ও আনুভূমিক স্কেলের মান প্রয়োজনের কারণেই বিভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যেখানে আট মিনিট (আলোর পৌঁছানোর সময় দিয়ে যদি মাপা হয়), এক আনুষঙ্গিক কক্ষতল থেকে অন্য আনুষঙ্গিক কক্ষতলের দূরত্ব সেখানে এক বছর অর্থাৎ ষাট হাজার গুণ বড়। কাজেই সঠিক স্কেলে অঙ্কন করলে জিওডেসিক রেখা সরলরেখা থেকে সামান্যই বিচ্যুত হবে।

banglainternet.com

দশম অধ্যায়

মহাকর্ষের অসমাহিত সমস্যাবলী

মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭), যিনি বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁর গবেষণা লিপিবদ্ধ কারার ডাইরিতে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের তারিখে এক মজার লেখা দেখা যায়। এখানে লেখা ছিল :

> মহাকর্ষ : অবশ্যই এই বল বিদ্যুৎ, চুম্বক এবং অন্যান্য প্রকার বলের সাথে পরীক্ষার মাধ্যমে এমনভাবে যুক্ত থাকবে যে বিপরীত ক্রিয়া ও সমতুল্য ফলের সাহায্যে একে অন্যান্য প্রকার বল হ'তে পরিবর্তিত করা যাবে। তথ্য ও পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়টিকে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা যাক।

এই বিখ্যাত বৃটিশ পদার্থবিদ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা 'সকলি গরল ভেল'। অবশেষে তিনি তাঁর ডাইরির এ অংশের ইতি টেনেছেন এই বলে :

> এখনকার মতো আমার পরীক্ষা এখানেই শেষ করছি ; মহাকর্ষ ও বিদ্যুতের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস একতিল শিথিল হয়নি, যদিও পরীক্ষাগুলি থেকে এমন সম্পর্কের প্রমাণ মিলছে না।

নিউটন হ'তে শুরু হয়ে যে মহাকর্ষ মতবাদ আইনস্টাইনের হাতে শেষ হয় সেই মতবাদ এক রাজকীয় নিঃসঙ্গতায় ভুগবে, এটা যেন কেমন লাগে ; এই মতবাদ যেন বিজ্ঞানের এক তাজমহল (চিত্র ২৯) মাত্র, যার সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য হাজারো গবেষণা ও অগ্রগতির কোনই সম্বন্ধ নেই। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের ধারণা তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নির্মিত হয়েছিল তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণাকে আশ্রয় করে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clark Maxwell : ১৮৩১-'৭৯)। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আইনস্টাইন

বা তাঁর অনুসারীরা মহাকর্ষের সাথে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎগতিবিজ্ঞানের কোন যোগসূত্র স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন।

চিত্র ২৯. অভিকর্ষ-মন্দির। মন্দির গাত্রের সমীকরণগুলি হচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক অভিকর্ষতত্ত্বের মূল সমীকরণসমূহ।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ মতবাদ কোয়ান্টাম মতবাদের প্রায় সমসাময়িক বলা যায় ; কিন্তু আগমনের ৪৫ বছরের মধ্যে মতবাদ দু'টির অগ্রগতির

banglainternet.com

হার দু'রকম। ম্যাক্স প্লাঙ্ক কর্তৃক সূচনার পর কোয়ান্টাম মতবাদ নীল বোর, লুই দ্য ব্রগলী, আরউইন শ্রোডিঙ্গার, ওয়েরনার হাইসেনবার্গ এবং অন্য বিজ্ঞানীদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করে একটি বিস্তৃতর শৃঙ্খলাপূর্ণ শাখা রূপে গড়ে উঠে। অন্যদিকে মহাকর্ষ মতবাদ আজ থেকে অর্ধশত বছর পূর্বে আইনস্টাইন কর্তৃক প্রচারের সময় যে পর্যায়ে ছিল আজও ঠিক সে অবস্থায় আছে। যখন শত শত এমনকি হাজার হাজার বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম মতবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন তখন মাত্র কতিপয় ব্যক্তি তাঁদের সময় ও আবেগকে মহাকর্ষ মতবাদের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত রেখেছেন। এর কারণ কি এই যে, শূন্যস্থান পদার্থের চেয়ে বেশী সরল? অথবা, মহাকর্ষ সম্পর্কে আমাদের যা কিছু করার ছিল তার সবই আইনস্টাইনের প্রতিভা দ্বারা উন্মোচিত হয়েছে? ফলে একে আরো উন্নত করার কৃতিত্ব থেকে আমাদের যুগকে বঞ্চিত করেছেন?

মহাকর্ষকে দেশ-কালের জ্যামিতিক ধর্মে রূপান্তরিত করার পর আইনস্টাইনের বিশ্বাস জন্মেছিল যে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের ঠিক একই প্রকারের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তাঁর এই ধারণা থেকে যে একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের (Unified field theory) উদ্ভব হয় তা খুঁড়িয়ে চলতে থাকে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আইনস্টাইন এখানে তাঁর পূর্বের কাজের মতো সহজ, সাবলীল ও বিশ্বাস উৎপাদনকারী কোন কিছু দিয়ে যেতে ব্যর্থ হন। এখন অনুমিত হয় যে, মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চৌম্বক বলের সঠিক সম্বন্ধ হয়তো আসবে মৌলিক কণার সম্যক জ্ঞান থেকে যাদের সম্পর্কে আজকাল আমরা অনেক কিছু শুনতে পাই এবং যখন জানা যাবে কেন নির্দিষ্ট চার্জ ও ভরবিশিষ্ট এ সকল কণার অস্তিত্বে দেখা যায়।

এ সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্ন দু'টি বস্তুকণার মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চৌম্বক বলের আনুপাতিক শক্তির সাথে জড়িত। ইতিপূর্বে এই পুস্তকের গোড়ার দিকে, যেখানে আমরা মহাকর্ষ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সেখানে, দেখেছি যে আকর্ষণবল ও দূরত্বের মধ্যেকার সম্বন্ধ বিপরীত বর্গীয় নিয়ম মেনে চলে। ফরাসী বিজ্ঞানী চার্লস এ. কুলম্ব (১৭৩৬-১৮০৬) ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে দেখেছিলেন যে, দু'টি চার্জের মধ্যেকার বল অনুরূপ এক বিপরীত বর্গীয় নিয়ম মেনে চলে।

আমরা এখন 4×10^{-26} গ্রাম ভরের দু'টি বস্তুকণার মাঝের মহাকর্ষ ও বৈদ্যুতিক বলকে বিবেচনা করতে পারি; কণা দু'টির ভর ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি এবং এরা r দূরত্বে অবস্থান করছে। কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী এখানে স্থির-বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ e^2/r^2, এখানে e ($4{\cdot}77 \times 10^{-10}$ স্থির বৈদ্যুৎ একক)* সর্বনিম্ন বৈদ্যুতিক চার্জ। অন্যদিকে, নিউটনের সূত্র অনুযায়ী মহাকর্ষ-বলের পরিমাণ পাওয়া যায় GM^2/r^2 সূত্রের দ্বারা, যেখানে G (6.67×10^{-8}) মহাকর্ষ ধ্রুবক এবং M (4×10^{-26} গ্রাম) ইলেকট্রন প্রোটনের মাঝামাঝি ভর। দুই প্রকার বলের অনুপাত হচ্ছে e^2/GM^2 যার সংখ্যামান 10^{36}-এর সমান। যে মতবাদ বৈদ্যুতিক ও মহাকর্ষ-বলের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাখ্যার দাবি রাখে তাকে অবশ্য বুঝিয়ে দিতে হবে কেন বৈদ্যুতিক আকর্ষণ মহাকর্ষ-আকর্ষণ অপেক্ষা 10^{36} গুণ বড়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই অনুপাতটি একটি শুদ্ধ সংখ্যা এবং ভৌত রাশিসমূহের পরিমাপ করার জন্য যে এককই ব্যবহার করা হোক না কেন এই সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। তত্ত্বীয় সূত্রে অনেক সময় সংখ্যামানের ধ্রুবক দেখা যায় এবং এই সংখ্যাগুলিকে গাণিতিক উপায়ে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের সংখ্যামানগুলি সাধারণত ক্ষুদ্র সংখ্যা যেমন 2π, $\frac{3}{8}$, $\pi^2/3$ ইত্যাদি। কিন্তু 10^{36}-এর মতো বড় ধ্রুবককে কি উপায়ে গাণিতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়?

বিশ বছরেরও আগে বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ পি. এম. এ. ডিরাক এ সম্পর্কে একটি মজার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, 10^{36} সংখ্যাটি ধ্রুবক নয়, বরং সংখ্যাটি সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল এবং বিশ্বের বয়সের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সম্প্রসারণশীল বিশ্ব মতবাদ অনুসারে আমাদের বিশ্ব 5×10^9 বছর বা 10^{17} সেকেণ্ড পূর্বে জন্মলাভ করেছিল। বছর বা সেকেণ্ড অবশ্যই সময় মাপার কোন মৌলিক একক নয়, ইচ্ছামতো পছন্দ করা একক মাত্র এবং এজন্যই সময়ের একক এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন এককটি পদার্থ ও আলোর মূল ধর্ম থেকে নির্ণয় করা যায়; এটা করার একটা যুক্তিযুক্ত পন্থা হচ্ছে কোন মৌলিক কণার ব্যাস

* যে চার্জ একই প্রকারের এক সেন্টিমিটার দূরে রাখা একটি চার্জকে এক ডাইন বলে বিকর্ষণ করে তাকে এক স্থিরবিদ্যুৎ একক চার্জ বলে।

BanglaInternet.com

অতিক্রম করতে আলোর যে সময় লাগে সে সময়কে নির্বাচন করা। যেহেতু সকল মৌলিক কণার ব্যাস প্রায় ৩×১০^{-১৩} সে. মিটার এবং আলোর বেগ ৩×১০^{১০} সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড, অতএব সময়ের প্রাথমিক একক হচ্ছে :

$$৩ \times ১০^{-১৩} / ৩ \times ১০^{১০} = ১০^{-২৩} \text{ সেকেণ্ড।}$$

বিশ্বের বর্তমান বয়স দিয়ে উপরের সময় এককে ভাগ করলে আমরা পাই $১০^{১৭} / ১০^{-২৩} = ১০^{৪০}$ এবং এটা বৈদ্যুতিক ও মহাকর্ষ বলের অনুপাতের প্রাপ্ত মানের সমান। এজন্যই ডিরাক বলেছিলেন যে, বৈদ্যুতিক ও মহাকর্ষ বলের অনুপাত আমাদের বিশ্বের বয়সের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেহেতু এটা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, সর্বনিম্ন বৈদ্যুতিক চার্জ (e) সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না। ডিরাক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে মহাকর্ষ ধ্রুবক (G) সময়ের সাথে হ্রাস যাচ্ছে এবং এই হ্রাসের পরিমাণকে বিশ্বের প্রসারণ ও তার ফলে পদার্থের ঘনত্ব কমার সাথে সম্পর্কিত করা হয়।

ডিরাকের এই মতবাদ পরবর্তীকালে এডওয়ার্ড টেলর (হাইড্রোজেন বোমার জনক) কর্তৃক সমালোচিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মহাকর্ষ ধ্রুবক G-এর পরিবর্তন হলে তার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহাকর্ষ হ্রাসের ফলে গ্রহদের কক্ষপথের ব্যাসের বিস্তার সাধন হ'ত (বলবিদ্যার সূত্রের সাহায্যে দেখানো যায়) এবং G-এর বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হ'ত। এই হ্রাসের ফলে সূর্যের অভ্যন্তরের স্থিতাবস্থায় গোলমাল দেখা দিত এবং ফলশ্রুতিতে সূর্যের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রার ও শক্তি উৎপাদনকারী তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়ার হারের পরিবর্তন দেখা যেত।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরীণ গঠন ও শক্তি উৎপাদনের মতবাদ থেকে যে কেউ দেখতে পারে যে সূর্যের উজ্জ্বল্য বা প্রভা* L পরিবর্তিত হয় $G^{৭\cdot২৫}$ হারে। যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিবর্তন সৌর উজ্জ্বল্যের চতুর্থ মূলকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের বর্গ দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায় এজন্য দেখা যায় যে, এটা $G^{২\cdot৪}$-এর সমানুপাতিক বা $(\text{সময়})^{২\cdot৪}$-এর ব্যস্তানুপাতিক হবে, যদি অবশ্য G সময়ের সাথে ব্যস্তানুপাতে কম-

* আলোক-উৎসের প্রভা, প্রতি সেকেণ্ডে বিকীর্ণ আলোকের পরিমাণ দ্বারা নির্দেশিত হয়।

বেশী হয়। এই পুস্তক রচনার সময়ে সৌরমণ্ডলের বয়স তিন বিলিয়ন বছর বলে পরিগণিত ছিল এবং বয়সের এই হিসাবকে সঠিক ধরে নিয়ে টেলর দেখিয়েছিলেন যে, ক্যামব্রিয়ান যুগে (Cambrian era ; ½ বিলিয়ন বছর পূর্বে) পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পানির স্ফুটনাঙ্কের ৫০° সেন্টিগ্রেড উপরে ছিল এবং আমাদের বাসভূমির সব পানিই ছিল বাষ্পীয় অবস্থায়। যেহেতু ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে পূর্ণগঠন সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। সেজন্য টেলর সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ডিরাকের মহাকর্ষ সংক্রান্ত মতবাদ সত্য হতে পারে না। গত দশবছরে সৌরজগতের বয়সের হিসাব অবশ্য পরিবর্তিত হয়ে উচ্চমানের দিকে গেছে এবং সঠিক অঙ্কটা পাঁচ বিলিয়ন বা তারও বেশী হতে পারে। যদি তাই হয় তাহ'লে প্রাচীন সমুদ্রের তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কের নিচে চলে এসে টেলরের আপত্তিকে নাকচ করে দেয়, অবশ্য যদি ঐ ধরনের গরম পানিতে ট্রাইলোবাইটস (Trilobites) ও সিলুরিয়ান মুলসস্ (Silurian molluses)-এর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। এর দ্বারা প্রাণের বিবর্তনের প্রথম-দিকে তাপীয় পরিব্যক্তির (Thermal mutation) হার বৃদ্ধি পেয়ে আদি জীবের উদ্ভব সংক্রান্ত মতবাদগুলি শক্তিশালী হ'ত এবং আরও গোড়ার দিকে অধিক উষ্ণতার সম্ভাবনা দ্বারা নিউক্লিক এসিড তৈরি নিশ্চিত করত। এখানে উল্লেখ্য যে, নিউক্লিক এসিড প্রোটিনের সহযোগী হিসেবে সকল জীবের বাসায়নিক ভিত্তি বলে বিবেচিত। সুতরাং মহাকর্ষ ধ্রুবকের পরিবর্তনশীলতার প্রশ্ন এখনও রুদ্ধ হয়ে যায়নি।

মহাকর্ষ ও কোয়ান্টাম-তত্ত্ব

আমরা দেখেছি, ভরসমূহের মধ্যেকার মহাকর্ষ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত নিউটনের সূত্র চার্জসমূহের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রের অনুরূপ এবং আইনস্টাইনের মহাকর্ষ-ক্ষেত্র তত্ত্বের সাথে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। কাজেই আশা করা সঙ্গত যে, একটি চার্জ যেমন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করে তেমনি একটি ভরও মহাকর্ষ-তরঙ্গের সৃষ্টি করবে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে আইনস্টাইন তাঁর সাধিক আপেক্ষিকতত্ত্বের মূল সমীকরণের সমাধানে দেখিয়েছিলেন যে আলোর বেগে গমনকারী মহাকর্ষীয় আলোড়ন এর প্রতিনিধিত্ব করে।

banglainternet.com

এ প্রকারের তরঙ্গের অস্তিত্ব থাকলে তারা শক্তি বহন করবে কিন্তু তাদের প্রাবল্য বা যে পরিমাণ শক্তি তারা বহন করবে তা অত্যন্ত অল্প। উদাহরণ-স্বরূপ, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কক্ষ-পথ পরিক্রমণকালে প্রায় ০·০০১ ওয়াট শক্তি নিঃসরণ করবে এবং এর ফলে পৃথিবী সূর্যের দিকে এক বিলিয়ন বছরে এক সেন্টিমিটারের এক মিলিয়ন ভাগ সরে আসবে। এমন দুর্বল প্রকৃতির তরঙ্গ খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় কেউ এখনো নির্দেশ করতে পারেনি।

তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মতো মহাকর্ষ-তরঙ্গও কি পৃথক শক্তি-প্যাকেট বা কোয়ান্টায় বিভক্ত? প্রশ্নটি প্রায় কোয়ান্টাম-তত্ত্বের সমসাময়িক এবং মাত্র দু'বছর আগে ডিরাক এর চূড়ান্ত উত্তর দিতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি মহাকর্ষ-ক্ষেত্র সমীকরণকে কোয়ান্টায়িত করতে সক্ষম হন এবং দেখান যে, মহাকর্ষ-কোয়ান্টা বা 'গ্রাভিটন'-এর শক্তি তার প্লাঙ্ক ধ্রুবক (h) গুণ; ঠিক যেমনটি আলোক-কোয়ান্টা বা ফোটনের শক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়। অবশ্য গ্রাভিটনের স্পিন ফোটনের স্পিনের দ্বিগুণ।

দুর্বল প্রকৃতির হওয়ার কারণে মহাকর্ষী তরঙ্গ নভো-বলবিদ্যায় কোন গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু মৌলিক কণা বিষয়ক পদার্থবিদ্যায় কি এদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না? পদার্থের এ সকল চূড়ান্ত খণ্ড যথাযথ 'ক্ষেত্রকণা' শোষণ বা বর্জন করে নানারূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তড়িৎ-চৌম্বক ক্রিয়ায় এভাবে (যেমন বিপরীত চার্জের পারস্পরিক আকর্ষণ) ফোটনের গ্রাভিটন শোষণ বা নিঃসরণ ঘটে; খুব সম্ভব মহাকর্ষীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে সম্পর্কিত। বিগত কয়েক বছর এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পদার্থের সমুদয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তিনটি স্বতন্ত্র ভাগে ভাগ করা যায়: ১. শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া তড়িৎ-চৌম্বক বল-এর অন্তর্ভুক্ত ২. দুর্বল মিথস্ক্রিয়া যেমন তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের বিটাক্ষয়; যেখানে একটি ইলেকট্রন ও একটি নিউট্রিনো নিঃসরিত হয়; ৩. মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া। এই ক্রিয়া দুর্বল বলে কথিত ক্রিয়ার চেয়েও অনেক গুণ বেশী দুর্বল। কোন মিথস্ক্রিয়ার শক্তি তার কোয়ান্টামের শোষণ বা নিঃসরণের হার অথবা সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফোটন নিঃসরণ করতে একটি নিউক্লিয়াসের 10^{-12} সেকেণ্ড (এক সেকেণ্ডের বিলিয়ন ভাগের মিলিয়ন ভাগ) সময় লাগে। পক্ষান্তরে নিউট্রনের বিটাক্ষয়ে সময়

BanglaInternet.com

লাগে ১২ মিনিট অর্থাৎ 10^{18} গুণ বেশী। হিসাব করলে দেখা যাবে, নিউক্লিয়াসের গ্রাভিটন নিঃসরণ করতে সময় লাগবে 10^{60} সেকেণ্ড বা 10^{43} বছর! এই ক্রিয়া দুর্বল মিথস্ক্রিয়া অপেক্ষা 10^{38} গুণ ধীরগতি।

এখন নিউট্রিনো নামক কণার সম্ভাব্যতা অর্থাৎ অন্য প্রকার পদার্থের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এদের কোন চার্জ বা ভর নেই। অনেক আগে অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে নীল বোর প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, "নিউট্রিনো এবং মহাকর্ষ-তরঙ্গ কোয়ান্টামসমূহের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?" দুর্বল মিথস্ক্রিয়া নামে কথিত ক্রিয়ায় নিউট্রিনো অন্যান্য কণার সাথে নিঃসরিত হয়, কিন্তু এমন প্রক্রিয়া কি নেই যেখানে শুধু নিউট্রিনোই সৃষ্টি হয়—যেমন ধরা যাক, উত্তেজিত নিউক্লিয়াস কর্তৃক একজোড়া নিউট্রিনো-অ্যান্টি নিউট্রিনো নিঃসরণ? কেউ এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু ঘটতে তো পারে; সম্ভবত মহাকর্ষ ক্রিয়ার সমান সমান স্কেলে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে। একজোড়া নিউট্রিনো থেকে স্পিনের মান আসবে দুই। ডিরাক গ্রাভিটনের জন্য ঠিক এই মান পেয়েছিলেন। এর সবকিছুই অনেকটা আকাশ-কুসুম চিন্তা, কিন্তু নিউট্রিনো আর মহাকর্ষের মধ্যেকার সম্পর্ক একটা ভীষণরকম উত্তেজনাকর তাত্ত্বিক সম্ভাবনা।

অ্যান্টি-গ্রাভিটি

এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর এক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে মিঃ ক্যাভর নামে এক ব্রিটিশ আবিষ্কারককে বর্ণনা করেছেন যিনি ক্যাভোরাইট নামে এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করেন, যা মহাকর্ষ-বলের কাছেও অভেদ্য। তামার পাত ও লোহার পাত ব্যবহার করে যেমন বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক বলকে ঠেকানো যায় তেমনি ক্যাভোরাইট পাত কোন বস্তুকে মহাকর্ষ-বল থেকে আড়াল করতে পারবে। ফলে কোন বস্তু ক্যাভোরাইটের উপর রাখলেই বস্তুটি তার সমস্ত বা আংশিক ওজন হারিয়ে ফেলবে। মিঃ ক্যাভর নৌকাসদৃশ একটি বিরাট গোলাকৃতি যান তৈরি করে তার চার-পাশে ক্যাভোরাইট নির্মিত পাত জড়িয়ে দিয়েছিলেন; এই পাতগুলি ইচ্ছামতো খোলা ও বন্ধ করা যায়। এক চাঁদনী রাতে চাঁদ যখন মাথার উপরে তখন তিনি তাঁর নৌকায় চড়ে মাটির দিকে সমস্ত পাত রেখে শুধু চাঁদের

দিকের পাতগুলি খুলে দিয়েছিলেন। এর ফলে যানটি পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের আকর্ষণ এড়িয়ে কেবলমাত্র চাঁদের মহাকর্ষটানের প্রভাবে আসে এবং মহাশূন্যে ভেসে চলতে থাকে। মিঃ ক্যাভের চাঁদের দেশের নানাবিধ অসাধারণ অভিজ্ঞতার স্বাদ লাভ করেন। এ ধরনের আবিষ্কার কেন অসম্ভব বা সত্যিই কি অসম্ভব? নিউটনের সার্বিক মহাকর্ষ-সূত্র, বৈদ্যুতিক চার্জের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কুলম্বসূত্র এবং স্যার হামফ্রে গিলবার্টের চুম্বক মেরুর মধ্যেকার বলের সূত্রের মধ্যে বড় রকমের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদি বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক বলকে আড়াল করা যায় তাহলে মহাকর্ষ-বলকে কেন আড়াল করা যাবে না?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক বলের আড়াল করার প্রক্রিয়াটি জানতে হবে; প্রক্রিয়াগুলি পদার্থের পারমাণবিক গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি অণু বা পরমাণু হচ্ছে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের সমন্বয়। ধাতুর মধ্যে অনেক মুক্ত নেগেটিভ ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে পজিটিভ চার্জের আয়নদ্বারা গঠিত স্ফটিক দেয়ালের অভ্যন্তরে। একটুকরা পদার্থ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে পদার্থের বৈদ্যুতিক চার্জগুলি উল্টোদিকে স্থানচ্যুত হয় এবং পদার্থটি বৈদ্যুতিকভাবে পোলারায়িত হয়েছে বলা হয়। এই পোলারায়নের ফলে সৃষ্ট নতুন বিদ্যুৎক্ষেত্র পূর্বতন ক্ষেত্রের উল্টোদিকে কাজ করে এবং উভয়ের মিলনে বিদ্যুৎক্ষেত্র শক্তি হ্রাস পায়। চুম্বক্-ক্ষেত্র আড়াল করার ব্যাপারটিও একই রকম, কারণ অধিকাংশ পরমাণু ক্ষুদ্র চুম্বক তৈরি করে এবং এগুলি বাইরের কোন চুম্বক-ক্ষেত্রের মাঝে রাখা হলে সরে যায়। সুতরাং এখানেও চুম্বক পোলারায়নের জন্য ক্ষেত্র-শক্তি হ্রাস পায়।

পদার্থের মহাকর্ষীয় পোলারায়ন সম্ভব হলে মহাকর্ষ-বলকে আড়াল করা যাবে। এজন্য বস্তু দু'রকম পদার্থে গঠিত হওয়া প্রয়োজন: কতকগুলির থাকবে পজিটিভ মহাকর্ষ ভর। এগুলি পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হবে আর কতকগুলির থাকবে নেগেটিভ মহাকর্ষ ভর এবং এরা পৃথিবী দ্বারা বিকর্ষিত হবে। প্রকৃতিতে পজিটিভ-নেগেটিভ চার্জ বা দু'রকমের চুম্বক মেরুর সমান আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু নেগেটিভ মহাকর্ষ-ভর এখন পর্যন্ত অজানা—বিশেষ করে অণু-পরমাণুর গঠনের ক্ষেত্রে। এজন্যই সাধারণ বস্তুকণাকে মহাকর্ষীয় ভাবে পোলারায়িত করা সম্ভব নয় বা মহাকর্ষ-বলকে আড়াল করার জন্য

প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রতি-কণাগুলির (antiparticle) খবর কি, যাদের নিয়ে পদার্থবিদরা গত কয়েক দশক ধরে নাড়াচাড়া করছেন? এমনটা কি হতে পারে না যে পজিট্রন ইলেকট্রন নেগেটিভ প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন এবং অন্যান্য প্রতি-কণার চার্জ বিপরীত তাদের মহাকর্ষভরও নেগেটিভ? প্রথম দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের পরীক্ষাভিত্তিক উত্তর খুব সহজ বলে মনে হয়; শুধু দেখতে হবে ত্বরণকারী যন্ত্রে সৃষ্ট পজিটিভ ইলেকট্রন বা নেগেটিভ প্রোটনের আনুভূমিক রশ্মি-মহাকর্ষ-ক্ষেত্র উপরের দিকে না নিচের দিকে বেঁকে যায়। যেহেতু কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট সকল কণা আলোর কাছাকাছি বেগে চলে এজন্য মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে এদের বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ (উপরে অথবা নিচের দিকে) অত্যন্ত নগণ্য: প্রতি কিলোমিটারে বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ পায় ১০^{-১২} সেন্টিমিটার (নিউক্লিয়াস ব্যাসের সমান)। অবশ্য এদের গতিবেগ ধীর করার চেষ্টা চালানো যেতে পারে, যেমন নিউট্রনের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। নিউট্রন নিয়ে পরীক্ষার সময় দ্রুতগতি নিউট্রনের একটা রশ্মি একটা গ্রাফাইট ব্লকের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয় এবং ব্লকের ভিতর থেকে বৃষ্টির ধারার মতো ধীরগতি নিউট্রন বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। কিন্তু নিউট্রনের বেগ কমে যায় ব্লকের নিউক্লিয়াসের সাথে এদের সংঘর্ষের ফলে এবং কার্বন বা ভারী-পানির মতো ভাল নিয়ন্ত্রকের সাথে এদের সম্পর্ক এমন যে পরপর অনেকগুলি ধাক্কা দিলেও এরা নিউট্রন শোষণ করে না। অবশ্য সাধারণ পদার্থের তৈরি নিয়ন্ত্রক অ্যান্টি নিউট্রনের জন্য মৃত্যু ফাঁদ-রূপে কাজ করবে এবং পদার্থের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কণাগুলি শোষিত হবে। কাজেই পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতি-কণাদের মহাকর্ষ-ভরের প্রকৃতির প্রশ্নটির এখনও মীমাংসা হয়নি।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়েছে, কারণ আমাদের কাছে এমন মতবাদ নেই যার দ্বারা আমরা মহাকর্ষ ও বৈদ্যুতিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যেকার সম্বন্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। অবশ্য এটুকু বলা যায় যে যদি কোন ভবিষ্যৎ-পরীক্ষা দেখাতে সমর্থ হয় যে প্রতিকণাদের মহাকর্ষ-ভর নেগেটিভ তাহলে এর ফলে গোটা আইনস্টাইনীয় মতবাদ সাংঘাতিক রকম মার খাবে; কারণ এতে করে সমতার নীতি ভুল প্রতিপন্ন হবে। ধরিত্রী গতিতে নেগেটিভ মহাকর্ষ-ভরের আপেল আইনস্টাইনের মহাকর্ষ প্রকোষ্ঠের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হ'লে আপেলটি 'উপরের দিকে' (মহাশূন্যযানের

banglainternet.com

তুলনায়) পড়তে থাকবে এবং বাইরে থেকে দেখা যাবে আপেলের উপর বাইরের প্রযুক্ত বলের মান শূন্য হওয়া সত্ত্বেও আপেলটি যানের বিগুণ পরিমাণ ত্বরণে গতিশীল। সুতরাং আমরা বাধ্য হব নিউটনের জড়তার সূত্র এবং আইনস্টাইনের সমতার নীতির একটাকে গ্রহণ করে অন্যটাকে বর্জন করতে; সন্দেহ নেই। নির্বাচনটা অত্যন্ত কঠিন—কারে রেখে কারে ছাড়ি।

ব্যবহৃত পরিভাষা

Angular momentum—কৌণিক ভরবেগ
Astronomical Unit—জ্যোতিষ একক

Base—ভূমি

Celestial Mechanics—নভো-বলবিদ্যা
Centripetal force—কেন্দ্রাভিগ বল
Centrifugal Force—কেন্দ্রাতিগ বল
Cone—শঙ্কু, কোণক
Cube—ঘনক
Cylinder—সিলিণ্ডার

Data—উপাত্ত
Derivative—জাতরাশি/লব্ধরাশি
Diagonal—কর্ণ
Differentiation—অন্তরকলন

Eccentricity—উৎকেন্দ্রিকতা
Ellipse—উপবৃত্ত
Escape velocity—পলায়ন বেগ
Experiment—পরীক্ষণ

Fluorescent—প্রতিপ্রভ

Graph—লেখচিত্র

Horizontal—আনুভূমিক

Inclined plane—হেলান তল
Integration—সমাকলন
Inertial mass—জড়ভর
Interstellar Space—আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্য

Kinetic energy—গতিশক্তি

Luminosity—প্রভা

Mass—ভর
Mathematical—গাণিতিক

Oscillation—দোলন

Parallelogram—সামন্তরিক
Parabola—অধিবৃত্ত
Physical laws—ভৌত নিয়মাবলী
Polarization—পোলারন/পোলারায়ন
Precession—অগ্রগমন
Principle of equivalance—সমতার নীতি
Pseudogravity—ছদ্ম-মহাকর্ষ

Quantized—কোয়া-চায়িত

Resultant—লব্ধি
Rotational motion—ঘূর্ণনগতি
Rectangle—আয়তক্ষেত্র

Saddle Surface—ঘোড়ার জিনের তল
Supperposition—উপরিপাতন
Scientist—বিজ্ঞানী
Scientific—বৈজ্ঞানিক
Superposition—উপরিপাত

Vertical—উল্লম্ব
Velocity—বেগ

banglainternet.com

অখণ্ড—Integral
অভিকর্ষ—Gravity
অন্তরকলন—Differential calculas
অধিবৃত্ত—Parabola

আনুভূমিক—Horizontal
আপেক্ষিক-তত্ত্ব—Theory of Relativity
আয়তক্ষেত্র—Rectangle

উপকেন্দ্র—Focus
উল্লম্ব—Vertical
উপরিপাতন—Superposition

কৃত্রিম উপগ্রহ—Satellite
কেন্দ্রাভিগ—Centrepetal

খোলক—Shell
ক্ষেত্রফল—Area

গাণিতিক—Mathematical

জাত-রাশি—Derivative

ঢাল—Slope

ত্বরণ—Acceleration
ত্রিভুজ—Triangle

দোলনকাল—Oscillation period
দিক রাশি—Vector quantity

নিয়ানডারথাল—Neanderthal

পড়ন্ত বস্তু—Falling bodies

ফাংশন—Function

বর্গক্ষেত্র—Square
বসবাসকারী—Antapodes
বলবিদ্যা—Mechanics
ব্যস্তানুপাতিক—Inversely proportional
ব্যাসার্ধ—Radius
ব্যবহারিক বিজ্ঞানী—Experimentalist
বেগ—Velocity

ভারসাম্য—Balannce
ভেক্টর—Vector

মাধ্যাকর্ষণ বল—Force of gravity

লম্ব—Perpendicular
লব্ধি—Resultant
লেখচিত্র—Graph

শঙ্কু—Cone

সরণ—Displacement
সমীকরণ—Equation
সমাকলন—Integral Calculas
সমত্বরণ—Uniform acceleration
সমানুপাতিক—Proportional
সিলিণ্ডার—Cylinder
সূচক সংখ্যা—Index number

হেলান তল—Inclined plane

banglainternet.com